رمضان
আকাবির কা রমাযান
(মাহে রমাযান ও আওলিয়ায়ে কেরাম)
শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া
মুহাযিরে মাদানী রহ.

আকাবির কা রমযান

(আওলিয়ায়ে কেরামের মাহে রমযান)

মূল

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ.

অনুবাদ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

উস্তাদ, সওতুল হেরা রহমানিয়া মাদ্রাসা, আরীচপুর, টঙ্গী,
ইমাম ও খতীব,ডেসা বায়তুল মামুর জামে মসজিদ
বিসিক রোড, টঙ্গী, গাজীপুর, ঢাকা।

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা মহাম্মাদ খুরশিদ আলম সাহেব

উস্তাদ,সওতুল হেরা রহমানিয়া মাদ্রাসা,আরীচপুর টঙ্গী গাজীপুর
ইমাম ও খতীব বায়তুন্ নূর জামে মসজিদ, গোপালপুর, গাজীপুর।

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুয যাকারিয়া

(সর্ব প্রকার কিতাবের আমদানীকারক, প্রকাশক ও পরিবেশক)
ব্লক-ডি, রোড-৬, বাসা-৩২,
মিরপুর-৬, ঢাকা, ০১৭১২ ৯৫৯৫৪১

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

আকাবিরদের কিছু কিছু মামূলাতের আলোচনা ফাযায়েলে রমযান" নামক কিতাবের শুরুর দিকে করা হয়েছে। অতঃপর আপ্‌বীতী'তে কতিপয় বন্ধুদের অনুরোধে হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু মাহে রমযান সংক্রান্ত আরো কিছু মামূলাতের আলোচনা করেছি। বর্তমান কিতাবটির সাথে তার মিল থাকায় এখানেও সেগুলো উল্লেখ করেছি।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানবী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু মাহে রমযানের মা'মূলাত জানার জন্য খাজা আজীজুল হাসান মরহুমের নিকট প্রশ্নাকারে একটি পত্র লিখেছিলাম। সে পত্রের জবাব পাওয়ার পর বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করে বলল, ওই সব প্রশ্নের আলোকে মুর্শিদি ও সায়্যিদী হযরত সাহারানপুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু এর মা'মূলাতও যেন উল্লেখ করি। স্বয়ং অধমের কাছেও এটা ভাল মনে হল তাই প্রথমে আমার প্রশ্নগুলো উল্লেখ করে পরে হযরত আকদাস সাহারানপুরীর মা'মূলাত উল্লেখ করার ইচ্ছা রাখি।

হযরত খাজা আজীজুল হাসান সাহেব মজযুব রহ.-এর নামে অধমের চিঠি

শ্রদ্ধেয় খাজা সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ?

আপনি লম্বা সময়ের জন্য থানা ভবন অবস্থান করছেন শুনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহপাক আপনাকে সব ব্যাপারে উন্নতি দান করুক। বিশেষ একটি কাজে আজ আপনাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি যে, এ ব্যাপারে জনাবের খেদমতে আরজ করাটাই যথার্থ হবে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবীর সাথে আপনার মতো এতো সহজ ও খোলামেলা সম্পর্ক সম্ভবত অন্য কারো নাই।

এজন্য এ ব্যাপারটা আপনার জন্যই সহজ হবে। অনেকদিন হতে হযরত থানবীর রমযানের মা'মূলাত জানার ইচ্ছা ছিল। নিজে সরাসরি হযরতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারছিনা, কারণ এটা আদবের পরিপন্থী। আর নিজে খেদমতে থেকে দেখবো তাও সম্ভব নয়। কারণ, এক দুই দিনে সব বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সবশেষে জনাবকেই উসিলা বানানোর ইচ্ছা করছি। আশা করি জনাব এতটুকু কষ্ট স্বীকার করে নিবেন। এ বিষয়ের কিছু প্রশ্ন বলে দিচ্ছি, যাতে করে সেগুলোর উত্তর সংগ্রহ করা জনাবের জন্য সহজ হয়।

১) ইফতারের সময়ের ব্যাপারে হযরতের মামূল কি? অর্থাৎ ক্যালেন্ডারের সময় অনুপাতে ইফতার করেন, না চাঁদ ইত্যাদির আলোর প্রতি খেয়াল করেন?।

২) ক্যালেন্ডারের সময় অনুপাতে ইফতার করলে, সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করেন, না সতর্কতামূলক কিছু পরে করেন?

৩) ইফতারের জন্য বিশেষ কিছুর ব্যবস্থা করা হয়, না যা মিলে তা দ্বারা ইফতার করা হয়? বিশেষ কিছুর ব্যবস্থা করা হলে তা কি?

৪) ইফতার ও মাগরিবের নামাযের মাঝে কতটুকু সময় ব্যবধান হয়?

৫) ইফতার বাড়ীতে করেন, না মাদ্রাসায়?

৬) ইফতার একাকী করেন, না সকলের সাথে মিলেমিশে?

৭) ইফতারের জন্য খেজুর বা যমযমের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় কি না?

৮) মাগরিবের পরের নফল নামাযে রমযানের খাতিরে কোন পরিবর্তন করা হয় কিনা? যেমনঃ সংখ্যায় বেশী হওয়া, রাকাত লম্বা হওয়া।

৯) আওয়াবীন নামাযে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করার মা'মূল কি? অর্থাৎ রমযান ও গায়রে রমযানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় কিনা?

১০) খানা খাওয়ার সময়ের ব্যাপারে হযরতের মা'মূল কি? অর্থাৎ কোন কোন সময় তিনি খানা খান? রমযানের ও গায়রে রমযানের খানা খাদ্যের পরিমাণের মধ্যে কোন ব্যবধান হয় কিনা?

১১) শুনতে পেলাম হযরত এ বছর অসুস্থতার দরুণ মাদ্রাসায় অন্য হাফেযদের পেছনে তারাবীহ পড়ছেন। তবে জানার বিষয় হচ্ছে যে,

হযরতের সব সময়ের অভ্যাস কি ছিল? তারাবীর নামায নিজেই পড়াতেন, না অন্যের পেছনে পড়তেন ? আর প্রতিদিন কতোটুকু করে তিলাওয়াত করা হয়?

১২) হযরতের এখানে কুরআনে পাক খতম করার বিশেষ কোন মা'মূল আছে কিনা? যেমন, ২৭ বা ২৯ তারিখে বা অন্য কোন রাতে খতম করা।

১৩) তারাবীহ শেষে খাদেমদের কাছে কিছু সময় ব্যয় করেন, না সাথে সাথে বাড়ী চলে যান? আর বাড়ী সাথে সাথে না গেলে ওই সময়টা কি কাজে ব্যয় করেন?

১৪) বাড়ী গিয়ে আরাম করেন, না অন্য কোন বিশেষ আমলে লিপ্ত হন? যদি আরাম করেন তাহলে তা কখন থেকে কখন পর্যন্ত?

১৫) তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআনে পাক তিলাওয়াতের মা'মূল কি? অর্থাৎ কতপারা তিলাওয়াত করেন এবং কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত?

১৬) সাহরীর ব্যাপারে হযরতের মা'মূল কি? অর্থাৎ কোন সময় শুরু করেন এবং সুবহে সাদিকের কতক্ষণ পূর্বে শেষ করেন?

১৭) সাহরীতে দুধ বা অন্য কিছু খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় কিনা এবং গরম রুটি তৈরী করা হয়, না প্রথম রাতের ঠাণ্ডা রুটিকেই যথেষ্ট মনে করা হয়?

১৮) ফজরের নামায বরাবরের মতো আকাশ ফর্সা হলে পড়া হয়, না কিছু পূর্বেই পড়ে নেয়া হয়?

১৯) দিনের বেলায় শোয়ার অভ্যাস আছে কিনা? থাকলে তা সকালে না দুপুরে?

২০) দৈনন্দিন কুরআনে পাক তিলাওয়াতের বিশেষ কোন মা'মূল আছে কিনা? অর্থাৎ রমযানের বিশেষ কোন পরিমাণ তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় কিনা?

২১) অন্য কারো সাথে কালামে পাকের দাওর করা বা অন্যকে শোনানোর মা'মূল আছে কিনা?

২২) অধিকাংশ সময় কালামে পাক দেখে দেখে পড়েন, না মুখস্থ?

২৩) ইতেকাফের ব্যাপারে হযরতের সব সময়ের মা'মূল কি? অর্থাৎ দশ দিনেরও বেশী যেমনঃ চল্লিশ দিনের ই'তেকাফ হযরত কখনও করেছেন কিনা?

২৪) রমযানের শেষ দশদিন ও পূর্বের বিশ দিনের মধ্যে মা'মূলাতের কোন পরিবর্তন হয় কিনা?

২৫) এছাড়াও হযরতের আরো বিশেষ কোন মা'মূলাতের কথা আপনি জানাতে পারলে বড়ই মেহেরবানী হবে।

উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর জবাব যদি বিস্তারিতভাবে দিতে সক্ষম হন এবং হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.এর মা'মূলাতের ব্যাপারে যদি কোন খোঁজ দিতে পারেন তা হলে তো কোন কথাই নেই। বর্তমান সময়ে হযরত থানবীই এমন এক ব্যক্তি যিনি হযরত হাজী সাহের রহ.এর বিস্তারিত মা'মূলাত বলতে পারবেন।

উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর সংগ্রহে জনাবের তো অবশ্যই কষ্ট হবে। তবে মাশায়েখে কেরাম ও ওলী আল্লাহদের মা'মূলাত খাদেমদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে এবং ইনশা-আল্লাহ এতে অনেকের উপকার হবে।

দোয়ার আশা ও দরখাস্ত করছি।

ইতি

যাকারিয়া, উফিয়া আন্‌হু

খাজা আজীজুল হাসান সাহেব রহ.-এর জবাব

জনাব মাখদুম ও মুকাররম!

আল্লাহপাক আপনার সুমহান ফয়েযকে দীর্ঘায়িত করুন।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার চিঠি পেয়েছি। তবে হযরতের মাহে রমযানের অনেক মা'মূলাত সম্পর্কে আমি নিজেই অজ্ঞ ছিলাম, তাই অনন্যোপায় হয়ে জনাবের চিঠিটি সরাসরি হযরতের খেদমতে পেশ করতে হয়েছে। তখন হযরত বললেন, উত্তরে শুধু এতটুকু কথা লিখে দেয়া হোক যে, চাইলে সরাসরি আমার থেকে যেন জিজ্ঞেস করে নেয়া হয়। জনাবকে অবহিত করার জন্য শুধু এতটুকুই

আরজ করছি যে, ইতেকাফে আছি। তাই পেন্সিল দিয়ে লিখতে হয়। আশাকরি বেয়াদবী মাফ করবেন।

আস্‌সালাম।

দোয়া প্রার্থী

আজীজুল হাসান, উফিয়া আন্‌হু।

চিঠিতে কোন তারিখ ছিল না। অবশ্য পরে হযরত আকদাস থানবীর মা'মূলাত তালাশ করে পাওয়া গেছে যা সামনে জায়গামত উল্লেখ করা হবে। একদিকে দোস্তদের পীড়াপীড়ি, অন্যদিকে আমারও মন চাইলো যে, ওইসব প্রশ্নের আলোকে, সায়্যিদী ও মুরশিদ হযরত আকদাস সাহরানপুরী কুদ্দিসাসিররুহুর মাহে রমযানের মা'মূলাতের উল্লেখ এখানে করে দেয়া হোক।

যদিও ফাযায়েলে রমযান ও তাযকেরাতুল খলীলে হযরতের মা'মূলাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসে গেছে। তথাপি উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর ধারামতে হযরতের মামূলাতের বিস্তারিত বর্ণনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আর অধমের জন্য এর যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে। কারণ ১৩২৮ হিজরী সন থেকে নিয়ে ১৩৪৫ হিজরী সন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় হযরতের সাথে রমযান কাটানোর সুযোগ হয়েছে। এ থেকে শুধুমাত্র একটি বছর বাদ পড়েছে। অর্থাৎ ১৩৩৪ হিজরীর রমযান মাস কারণ, ওই বছর রমযান মাসে হযরত কুদ্দিসাসিররুহু মক্কা মুকাররমায় ছিলেন, আর অধম (ভারতের) সাহরানপুর অবস্থান করছিলাম।

মাহে রমযান ও হযরত আকদাস সাহারানপুরী রহ.এর মা'মূলাত

১) হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর এখানে ঘড়ির সময়ের খুব গুরুত্ব ছিল। ঘড়ির টাইম নির্ভুল রাখার জন্য সারা বছর লোক ঠিক করা থাকত।

তবে রমযান মাসে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ডাকঘর, টেলিফোন ঘর ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য স্থানের ঘড়ির সাথে নিজেদের ঘড়ির টাইম মিলানো হত। ক্যালেন্ডারের সময় অনুযায়ী ইফতার করা হত। তবে অতি সতর্কতাবশতঃ ক্যালেন্ডারের থেকে দুই তিন মিনিট পরে করা হত।

আ'লা হযরত জনাব আব্দুর রহীম রায়পুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর দরবারেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত। তবে হযরতের দরবারে অর্থাৎ রায়পুরে যেহেতু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হত, তাই উদয় অস্তের সাথে ঘড়ি মিলিয়ে রাখার প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হত।

আমার আব্বাজান ও চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর দরবারে ক্যালেন্ডার বা ঘড়ির তেমন গুরুত্ব ছিলনা,বরং হাদীসের ওপর আমল করনার্থে আকাশের দিকেই বেশী নজর রাখা হত। হাদীসে পাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাত্রি যখন এখান দিয়ে (আকাশদিগন্ত দিয়ে) আগমন করবে এবং দিন প্রস্থান করবে তখন তোমরা ইফতার করবে।

২) পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্যালেন্ডারের সময় থেকে অতি সতর্কতা বশতঃ দুই-তিন মিনিট পরে ইফতার করা হত।

৩) ইফতারীতে খেজুর ও যমযমের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়া হত। সারা বছর যে সমস্ত হাজীগণ হযরতের জন্য খেজুর ও যমযমের পানি হাদিয়া নিয়ে আসতেন সেগুলোকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রমযানের জন্য জমা রাখা হত। এভাবে রমযান পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে যমযমের পানি জামা হয়ে যেত অবশ্য খেজুরগুলো নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিলে রমযানের পূর্বেই তা বন্টন করে দেয়া হত। ইফতারের সময় হযরতের অর্ধ পেয়ালা বা পৌনে এক পেয়ালা দুধ মিশ্রিত চা পানের অভ্যাস ছিল। আর বাকী অংশ এ অধমকে দান করা হত।

৪) ইফতার ও মাগরিব নামাযের মধ্যে প্রায় দশ মিনিটের ব্যবধান হত। যাতে করে যারা বাড়ীতে ইফতার করে তারাও জামাতে শরীক হতে পারে।

৫) মাদ্রাসায় ইফতার করাই হযরত কুদ্দিসাসির্রুহুর মা'মূল ছিল। পনের বিশজন খাদেম বা মেহমান হযরতের সাথে ইফতার করতেন। মদীনাপাকে অবস্থান কালে মাদ্রাসায়ে শরইয়্যায় ইফতার করার মা'মূল ছিল।

৬) ওপরে (পাঁচের ভেতর) উল্লেখ করা হয়েছে।

৭) তিনের ভিতর উল্লেখ করা হয়েছে।

৮) বাদ-মাগরিব নফলের সংখ্যায় কোন পরিবর্তন হত না, তবে রাকাতগুলো লম্বা লম্বা হত। নামাযে সাধারণত সোয়া পারা তিলাওয়াত

করার অভ্যাস ছিল। রমযান মাসের তারাবীহে হযরত যে পারাটি পড়তেন বাদ-মাগরিব নফলে তিনি ওইটিই পড়তেন।

৯) পূর্বে আটের ভেতর উল্লেখ করা হয়েছে।

১০) আওয়াবিন শেষে বাড়ী গিয়ে খানা খেতেন। প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট এতে ব্যয় হত। রমযান মাসে খানার পরিমাণ খুব কম হয়ে যেত আমাদের অঞ্চলে অর্থাৎ কান্দলা ও গাঙ্গুহে সাহরীতে পোলাও খাওয়ার প্রচলন একেবারেই ছিলনা, বরং এ অঞ্চলের লোক সাহরীতে পোলাও খাওয়ার ঘোর বিরোধী। এখানকার লোকজনের ধারণা যে, সাহরীতে পোলাও খেলে পানির পিপাসা বেশী হয়। সাহরীতে সর্ব প্রথম অধমের পোলাও খাওয়ার সুযোগ হয় সাহারানপুর এসে হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর দরবারে। ইফতারের পর খানা খাওয়ার অভ্যাস অধমের কখনও ছিল না। কারণ, এতে তারাবীহের নামাযে কুরআন পড়তে কষ্ট হয়। অবশ্য যতদিন স্বাস্থ্য ভালো ছিল, ততদিন সাহরীতে "আনাড়ির বন্দুক ভরার" মতো অভ্যাস অধমের ছিল। একবার হযরতের মজলিসে অধমের ব্যাপারে আলোচনা উঠলো যে, সে ইফতারীতে খানা খায়না। তখন হযরত বললেন, ইফতারীতে আবার খানা খায় কিভাবে? যারা খায় তারা নিয়ম রক্ষা করে মাত্র।

১১) আমার হযরত কুদ্দিসাসির্রুহুর নিজেই তারাবীতে কালামুল্লাহ শরীফ শুনাতেন। তবে শেষ দুই বছর অসুস্থতা ও দুর্বলতার দরুণ কালামুল্লাহ শরীফ শুনাতে পারেন নাই। ছাত্রাবাস নির্মাণের পূর্বে পুরাতন মাদ্রাসা ভবনের মসজিদেই তারাবীর নামায পড়াতেন। পুরাতন ছাত্রাবাস নির্মাণের পর প্রথম বছর হযরতের নির্দেশে আমার আব্বাজান তারাবীহ পড়িয়েছিলেন। এরপর থেকে সব সময় হযরত কুদ্দিসাসির্রুহু তারাবীর নামায পড়াতেন।

১২) হযরত কুদ্দিসাসির্রুহুর এখানে সাধারণতঃ ২৯শের রাত্রে কুরআনে পাক খতম করার মা'মূল ছিল। শুরুতে কিছুদিন সোয়া পারা করে অতঃপর শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন এক পারা করে পড়া হত।

এ ব্যাপারে হযরত শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী কুদ্দিসাসির্রুহুর বিস্ময়কর একটি ঘটনা আছে। তা হচ্ছে যে বছর রমযান মাস ২৯ শের হত ওই বছর রমযানের প্রথম দিনের তারাবীতে তিনি দুই পারা পড়তেন আর

৩০ শে হলে একপারা পড়াতেন। হযরত শাহ আব্দুল আজীজ সাহেব দেহলবী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর নিজ মসজিদে প্রথম দিনের তারাবীহ পড়ানোর পর হযরত শাহ আব্দুল কাদের সাহেবের মসজিদে অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাতেন যে, সেখানে এক পারা পড়া হয়েছে না দুই পারা। দুই পারা হয়ে থাকলে শাহ সাহেব ঘোষণা করে দিতেন, এবারকার রমযান ২৯ দিনের হবে। একে ইলমে গায়েব বলে না, বরং ইলমে কাশ্‌ফ বলে।

তারাবীর পর পনের হতে বিশ মিনিট হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর মাদ্রাসায় আরাম করতেন। খাদেমরা তখন হযরতের শরীর চাপতে থাকত এবং কালামুল্লাহ শরীফের ব্যাপারে আলোচনা চলতে থাকত। যেমন, কেউ ভুল লোকমা দিয়েছে, বা তারাবীতে অন্য কোন ঘটনা ঘটে গেছে। এসব বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ রুচিকর পর্যালোচনা চলত এবং অন্যরা হাসিমুখে খোশ মেজাজে এগুলো উপভোগ করতে থাকত।

হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর পিছনে তারাবীহ পড়ার জন্য অনেক দূর-দূরান্ত হতে হাফেযরা আগমণ করত। অধমও স্বীয় মসজিদে তারাবীর নামায শেষে অতি দ্রুত হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর দরবারে পৌছে যেতাম। স্বীয় মসজিদ বলতে, অধিকাংশ রমযানে হাকীম ইসহাক সাহেবের মসজিদে আবার কখনো আম্মাজীর চাপ ও নির্দেশে হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর বাড়ীতে তারাবীহ পড়াতে হত। তারাবীহ শেষে হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর এখানে পৌছে দেখতাম মাত্র চার কি ছয় রাকাত হয়েছে। কারণ হাকীম ইসহাক সাহেব মরহুমের মসজিদে নামায আগে শুরু হত এবং মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাসের মসজিদে বিলম্বে শুরু হত। তদুপরি স্বীয় অযোগ্যতার ফলে অধম পড়তোও খুব দ্রুত।

একবারকার ঘটনা ঃ হযরত সূরায় তালাক শুরু করলেন এবং

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ الاية

আয়াতটি পড়তে লাগলেন। অধম তাড়াহুড়া করে লোকমা দিয়ে পড়লাম ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ

হযরত হাফেয মুহাম্মাদ হুসাইন সাহেব রহ. হযরতের নির্ধারিত শ্রোতা ছিলেন। হযরতের সাথে রমযান অতিবাহিত করার জন্য প্রতি বছর তিনি

আজরাড়া হতে সাহারানপুর চলে আসতেন। উপরন্তু ওই দিন হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব এবং আমার চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুমও হযরতের পিছনে নামায পড়ছিলেন। আমার লোকমা শুনে তারা তিন জন একসাথে বলে উঠলেন يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ তারাবীর পর নিয়মানুযায়ী হযরত কুদ্দিসাসিররুহু শুয়ে পড়লেন এবং অধমকে লক্ষ করে বললেন, মৌলবী যাকারিয়া কি নামাযে ঘুমাচ্ছিলে? আমি বললাম, জি না! হযরত! তবে এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ..

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ لَا تُخْرِجُوهُنَّ

ইত্যাদি বাক্যগুলো বহুবচন ব্যবহার হয়েছে। তাই আমার ধারণা হল . يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বহুবচন হবে। يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّএক বচন কেমন করে শুদ্ধ হবে? হযরত সাহারানপুরী কুদ্দিসাসিররুহু বললেন, কুরআনে পাকেও যুক্তি খাটাতে চাও। আমি বললাম হযরত! এটিতো যুক্তি নয়, বরং আরবী ব্যাকরণের কথা। হাফেয মোহাম্মদ হুসাইন সাহেব একবার ভুল লোকমা দিয়ে বসলেন। অধম তখন শুদ্ধ লোকমা বলে দিলাম। তখন নামাযের মধ্যেই হাফেয সাহেবের জবান থেকে অনিচ্ছাকৃত ভাবে বের হয়ে গেল, হাঁ। অতঃপর আমি যে লোকমা দিয়েছিলাম তিনিও তা দিলেন। তারাবীর পর হযরত কুদ্দিসাসিররুহু যখন আরাম করছিলেন তখন আমি বললাম, হযরত কি আমার লোকমা গ্রহণ করেছিলেন, না হাফেয সাহেবের? আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, হাফেয সাহেবের নামায তো হাঁ বলার কারণে ভেঙ্গে গেছে। এমতাবস্থায় হযরত যদি বলেন, হাফেয সাহেবেরটি, তাহলে আমি বলবো যে, সকলের নামায ভঙ্গ হয়ে গেছে। হযরত কুদ্দিসাসিররুহু আমার আহাম্মকীর কথা বুঝে ফেললেন। তাই বললেন, আমি কি পাগল যে, হাফেয সাহেবের লোকমা নিবো? মোটকাথা, হযরতের ওই আরামের সময়টুকু এ জাতীয় খোশালাপের মধ্যে যেত। কোনদিন বিশেষ কোন আয়াতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা উঠলে, সে বিষয়েও কথা বলতেন।

একবার আয়াত وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ (তোমরা যদি আল্লাহপাকের নেয়ামত সমূহ গণনা করতে চাও তাহলে গণনা করে শেষ করতে পারবেনা।) এ

আয়াত প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ পাকের এক একটি নেয়ামতের মধ্যে হাজারো নেয়ামত রয়েছে। এজন্য আল্লাহপাক تَعُدُّوا বলেছেন।

১৪) উপরের বর্ণনা অনুপাতে তারাবীর পর কিছুক্ষণ মাদ্রাসায় আরাম করে বাড়ীতে চলে যেতেন। পনেরো থেকে বিশ মিনিট পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। মহল্লার কিছু মহিলা ওই সময় হযরতের বাড়ীতে আসতেন। তাদেরকেও কিছু কিছু ইরশাদ করতেন। এরপর আড়াই কি তিন ঘন্টা ঘুমাতেন।

১৫) তাহাজ্জুদ নামাযে সাধারণতঃ দুই পারা পড়তেন। সময়ানুসারে কখনো কখনো এতে কমবেশি হত।

বযলুল মাজহুদ লেখার সময় হাদীসে নাজায়ের এর বর্ণনা আসলে হযরত কুদ্দিসাসিররুহু অধমকে বললেন হাদীসটি একটি কাগজে লিখে নাও। আজকের তাহাজ্জুদ এর ধারা অনুপাতে পড়া হবে। হাদীসে নাজায়েরের ধারা হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সংকলিত ও প্রচারিত কুরআনে কারীমের ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন। তথাপি ওই ধারা অনুপাতে হযরতের তিলাওয়াতের ইচ্ছা প্রকাশ হাদীসের ওপর আমল করার প্রতি তাঁর চরম আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। কবি বলেন, স্বয়ং প্রেমই তোমাকে প্রেমের নিয়ম শিখিয়ে দেবে।

হযরত শায়খুল হিন্দ কুদ্দিসাসিররুহুর সম্পর্কে শুনেছি যে, বিতরের পর দু'রাকাত নফল নামায তিনি সব সময় বসেই পড়তেন। একবার কেউ আরজ করলো, হযরত! এতে তো অর্ধেক সাওয়াব পাওয়া যাবে? উত্তরে হযরত বললেন, হা-ভাই, সাওয়াব বেশী না হলেও নবীজী (সাঃ)এর ইত্তেবার মধ্যে মন লাগে বেশি।

অধমের ধারনা মতে নিয়মানুযায়ী এতে সাওয়াব তো অর্ধেকই হবে, তবে এতে সুন্নাত ও নবী প্রেমের প্রতি যে অনুরাগ ও আগ্রহ প্রকাশ পায় তার সাওয়াব দাঁড়িয়ে পড়ার সাওয়াব থেকে অনেক গুণ বেশী হয়ে যাবে। কথিত আছে যে, মজনু স্বীয় প্রেমিকা লায়লার দেশের কুকুরকেও মহব্বত করত।

১৬) ঋতুভেদে সুবহে সাদিকের দুই কি তিন ঘন্টা পূর্বে ঘুম থেকে জাগার মা'মূল ছিল। আর সাহরী সাধারণতঃ সুবহে সাদিকের আধা ঘন্টা পূর্বে শুরু করতেন এবং এতে দশ পনের মিনিট ব্যয় হত। সুবহে সাদিকের পনের বিশ মিনিট পূর্বে খানা-পিনা থেকে ফারেগ হয়ে যেতেন।

১৭) সাহরীতে দুধ বা এ জাতীয় কোন কিছুর ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত না তবে ফিন্নি বা পায়েশ হাদিয়া আসলে ঘর ওয়ালাদেরকে দিয়ে দেয়া হত। হযরত কুদ্দিসাসিররুহু তা থেকে এক-আধ চামচ খেতেন। সাহরীতে হযরতের এখানে মাঝেমধ্যে পোলাও পাকানো হত। তবে ইফতারীর জন্য কখনো পোলাও পাকানো হত না।

পূর্বে সম্ভবত উল্লেখ করা হয়েছে যে, কান্ধলা বা গাঙ্গুহে সাহরীতে পোলাও খাওয়াকে অপরাধ মনে করা হত। সেখানকার লোক জনের ধারণা যে, এতে পিপাসা বেশী হয়। ফলে হযরতের দরবারে আসার পূর্বে সাহরীতে পোলাও খাওয়ার সুযোগ অধমের হয়নি। কিন্তু যখন হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর দরবারে আসলাম তখন থেকে যতদিন শরীর-স্বাস্থ্য ভাল ছিল ততদিন পর্যন্ত সাহরীতে পোলাও খাওয়ার মা'মূল ছিল। আর দশ বার বছর পূর্বে থেকে যখন মেহমানদের চাপ বেড়ে গেলো তখন থেকে ইফতারীতে পোলাও এবং সাহরীতে গোশত রুটি ছাড়াও জর্দা খাওয়ার অভ্যাস অদমের হয়েছিল। হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর এখানে সাহরীর জন্য তাজা রুটি তৈরী করা হত। সাহরীর সময় হযরতের এখানে চা পানেরও মা'মূল ছিল। সাহরীতে নিজে চা পানের কথা অধমের মনে পড়ে না। কারণ, রমযানে বাদ ফজর শুয়ে পড়া অধমের বরাবরের অভ্যাস।

১৩৩৮ হিজরীতে অধমের প্রথম হজ্বের সফর হয়। ওই সফরের রমযান মাস থেকে শুরু করে বরাবর রমযানের রাত্রে না ঘুমানোর অভ্যাস করেছিলাম। আজ থেকে সাত কি আট বছর পূর্ব পর্যন্ত খুব গুরুত্বের সাথে এ অভ্যাস চলে আসছিল। কিন্তু এখন রোগ- ব্যাধির প্রকোপে সমস্ত মা'মূলাতই ছুটে গেছে।

(১৮) হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর এখানে রমযান মাসেও ফজরের নামায আকাশ ফর্সা হলে পড়া হত। তবে অন্য মাস হতে দশবারো মিনিট পূর্বে পড়া হত।

(১৯) বারো মাসই ফজরের পর হতে ইশ্‌রাক পর্যন্ত যিকির অযীফা আদায় করা হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর মা'মূল ছিল। শীতের মৌসুমে মাদ্রাসার আঙ্গিনায় চারপায়ীর ওপর বসে সেগুলো আদায় করতেন। তখন মুরাকাবাও করতেন। ১৩৩৫ হিজরী সন পর্যন্ত বারো মাসেই ইশরাক নামায পড়ার পর এক ঘন্টা আরাম করতেন। অতঃপর গরমের মৌসুমে বেলা

একটা পর্যন্ত আর শীতের মৌসুমে বারটা পর্যন্ত বযলুল মাজহুদ লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এরপর যোহরের আযান পর্যন্ত কায়লুলা করতেন।

২০) ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত হযরত কুদ্দিসাসিররুহু সব সময় নিজেই তারাবীহ পড়াতেন। যোহর নামাযের পর তারাবীহের পারাটি হাফেয মুহাম্মাদ হুসাইন সাহেব আজরাড়ীকে শোনাতেন। কারণ হাফেয মুহাম্মদ হুসাইন সাহেবের কাজই ছিল এটা। এ জন্যই তিনি রমযানে সাহারানপুর তাশরীফ নিয়ে আসতেন। কখনো কখনো হাফেয সাহেবের অনুপস্থিতিতে অধমকে শুনতে হত। আর হযরত মদিনাপাকে অবস্থানকালে যোহরের পর তিলাওয়াত শোনার জিম্মাদারী অধমের ওপরই ছিল। "বজল" লেখার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে অধমও হেজাজ সফর থেকে চলে আসলাম। ফলে তখন বাদ যোহর মুহতারামা বিবি সাহেবাকে প্রতিদিন এক পারা করে শোনানোর মা'মূল ছিল। বাদ যোহর যে পারাটি শোনাতেন সেটিই বাদ মাগরিব আওয়াবীনে এবং পরে তারাবীতে শোনাতেন।

২১) ১৩৩৩ হিজরী সনে হজ্বের সফরের পূর্বে তারাবীতে সে পারাটি শোনাতেন, বাদ আসর তা আমার আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর সাথে দাওর করতেন। আব্বাজান ছাড়া অন্য কারো সাথে দাওর করতে হযরতকে দেখিনি।

২২) হযরত কুদ্দিসাসিররুহুকে দেখে দেখে কালামেপাক তিলাওয়াত করতে খুব কম দেখেছি। তবে একেবারে দেখিনি যে, এমন নয়, মাঝে মধ্যে দেখেছি।

২৩) ইন্তেকালের দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিনের ইতেকাফ ত্যাগ করতে হযরতকে কখনো দেখা যায়নি। ইন্তেকালের পূর্বের দুই বছর হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু বিভিন্ন ধরণের রোগের শিকার হন। ফলে সমস্ত মা'মূলাত ঠিক রাখা হযরতের জন্য মুশকিল হয়ে যায়। মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণের পূর্বে পুরাতন মাদ্রাসা ভবনের মসজিদেই ইতেকাফ করতেন। ছাত্রাবাস নির্মাণের পর ১৩৩৫ হিজরী সন হতে ছাত্রাবাস মসজিদে ইতেকাফ করতেন। ইতেকাফের সময়ও বজলুল মাজহুদ লেখার কাজ বন্ধ হত না। কুলসূমিয়্যা মসজিদের পশ্চিম পাশে যে হুজরাটি ছিল, রমযানের বিশ তারিখে "বজল" সংক্রান্ত সমস্ত সহযোগী কিতাব সেখানে পৌছে যেত। বাদ-ফজর অধম ওই সমস্ত সহযোগী কিতাব সমূহ মসজিদের ভেতর নিয়ে যেতাম ওই দিনের লেখা শেষ হলে পুনরায়

ওই হুজরা শরীফে নিয়ে রেখে দিতাম। রমযানের শেষ দশ দিন ছাড়া হযরতকে কখনো ইতেকাফ করতে দেখিনি।

২৪) রমযানের শেষ দশদিন ও প্রথম বিশ দিনের ইবাদত ও মা'মূলাতে বিশেষ কোন পার্থক্য হত না। পার্থক্য শুধু এতটুকু হত যে, শেষ দশ দিন ঘুম থেকে কিছু আগে উঠা হত।

ফাযায়েলে রমযানের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে এসেছি যে, হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর দরবারে রমযান ও অন্যান্য মাসের ইবাদতের মধ্য অনেক রকম ব্যবধান দেখা যেতো। ফাযায়েলে রমযানে এসব বিষয় লিখে এসেছি।

২৬) এগুলো ছাড়া হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর মাঝে মধ্যে পত্র পত্রিকা দেখার যে অভ্যাস ছিল, রমযানে তা হত না। যে দুই বছর আব্বাজানের সাথে কালামুল্লাহ শরীফের দাওর করেছিলেন ওই দুই বছর ব্যতীত অন্যান্য বছরগুলোতে তাসবীহ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে যিকির করতে হযরতকে দেখা যেতো। ওই সময় খাদেমরা কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিতেন।

দশ পনের জনের মতো লোক, যেমন কান্ধলা হতে মুতাওয়াল্লী জলীল সাহেব মুতাওয়াল্লী রিয়াযুল ইসলাম সাহেব এবং কেউ কেউ মিরাঠ থেকে হযরতের সাথে রমযানের কিছু অংশ কাটানোর জন্য এখানে আসতেন। তবে তারা ইতেকাফ করতেন না। কারণ, ঈদের একদিন আগে বাড়ী ফিরে যাওয়ার নিয়তে তারা আসতেন। তাযকেরাতুল খলীলে হযরত সাহারানপুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মামূলাতের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, রমযানুল মুবারকের চাঁদ যখন দেখা যেতো, যা হচ্ছে কুরআন নাযিলের মাস কালামুল্লাহ শরীফ বেশী বেশী তিলাওয়াতের মাস তখন হযরতের সাধনা ও পরিশ্রমের কোন সীমা থাকত না। তারাবীতে সোয়া পারা শোনানোর অভ্যাস ছিল। কুরআন শরীফের প্রতি রুকুতে তিনি নামাযের রুকু করতেন। এভাবে প্রতিদিন বিশ রুকু করে ২৭ শে রমযানে কালামে পাকের খতম পূর্ণ করে দিতেন। মাজাহেরে উলুমের শিক্ষক হওয়ার পর পুরাতন মাদ্রাসা ভবনের মসজিদে তারাবীহ পড়াতেন। আর ছাত্রাবাস নির্মাণের পর দুই বছর ছাত্রাবাস মসজিদে কুরআন পাক শুনিয়েছেন। ছাত্রাবাস নির্মাণের পর প্রথম বছর আব্বাজান সেখানে কালামে পাক শুনিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বছর হতে হযরত কুদ্দিসাসিররুহু তারাবীহ পড়ানো আরম্ভ করেন। ওই সময় ছাত্রাবাস মসজিদেই হযরত ইতেকাফ করতেন।

হযরতের পিছনে তারাবীহ পড়ার জন্য লোকজনের খুব ভিড় হত। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন রমযান কাটানোর জন্য হযরতের দরবারে এসে যেতো। অনেক হাফেযে কুরআন নিজে তারাবীহ না পড়িয়ে হযরতের পিছনে পড়ার জন্য জমা হয়ে যেত। মাঝামাঝি আওয়াজে ধীরে ধীরে তিনি তিলাওয়াত করতেন। প্রত্যেকটি শব্দ ভিন্ন ভিন্নভাবে বুঝা যেত। কুরআনপাক যেহেতু যৌবনে পদার্পন করে মুখস্থ করেছিলেন তদুপরি তিলাওয়াতের মাঝে ধ্যান তন্ময়তার কারণে কখনো কখনো আটকে যেতেন সত্য, তবে ভুল পড়াতে কখনো দেখা যায়নি। হঠাৎ পড়া বন্ধ হয়ে যেত বা তাশাবুহ হয়ে যেত। তখন পেছনের হাফেযরা অনেকে দ্রুত লোকমা দিয়ে বসত, আবার অনেকে ভুল লোকমা দিয়ে দিত। কিন্তু হযরত তা গ্রহণ করতেন না, বরং নিজে চিন্তা করে বা যারা শুদ্ধ লোকমা দিয়েছে তাদেরটি গ্রহণ করে সামনে অগ্রসর হতেন। কিন্তু এতে হযরত কখনো রাগ করতেন না, বরং সালাম ফিরিয়ে সান্তনা দিয়ে বলতেন হাফেয যখন নিজেই ভুলে যায় তখন শ্রোতাদের ভুল হওয়াটাই স্বভাবিক। তাই, ভুল করে কেউ যদি অশুদ্ধ লোকমা দেয় তাহলে এতে অবাক হওয়ার কি আছে?

হযরত সব সময় নিজেই তারাবীর নামায পড়াতেন। কিন্তু বয়স যখন সত্তরের কোঠায় গিয়ে পৌছল তখন এ কাজ হযরতের জন্য কঠিন হয়ে গেল। হযরত বলতেন, রুকুতে যখন যাই তখন মনে হয় দ্বিতীয় রাকাতের জন্য আর দাঁড়াতে পারব না, কিন্তু হিম্মত করে দাঁড়িয়ে যাই। এভাবে বিশ রাকাত পূর্ণ করি। প্রত্যেক রাকাতেই পড়ে যাওয়ার আশংকা হয়। সিজদা হতে পুনরায় উঠে দাঁড়ানো পাহাড়ে চড়া থেকেও বেশী কঠিন মনে হয়। এ অবস্থায়ও দুই বছর পর্যন্ত হযরত সামলে নিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর শক্তি যখন অপারগতা প্রকাশ করল, তখন বাধ্য হয়ে তারাবীতে কুরআনে পাক শোনানো বন্ধ করতে হল। তবে এর ক্ষতি পূরণ স্বরুপ অন্যদের দ্বারা তা শোনা এবং নিজে বেশী বেশী তিলাওয়াত করার ব্যস্ততা বেড়ে গেল। রমযান মাসে ইশরাকের সময় থেকে নিয়ে এগারটা পর্যন্ত একটানা তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। (তাযকেরাতুল খলীল)

তাযকেরাতুল খলীলে মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর যে মামূলের কথা লিখেছেন তা বযলুল মাজহুদ রচনার কাজ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত ছিল।

বাদ যোহর হযরত তারাবীর পারাটি শোনাতেন। এটা শোনার জন্য জনাব আলহাজ্ব হাফেয মোহাম্মাদ হুসাইন সাহেব মরহুম প্রতি বছর আজরাঢ়া হতে এখানে আগমন করতেন, যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে। বাদ আসর ইফতার পর্যন্ত মাদ্রাসার পুরাতন ভবনে অবস্থান করতেন। খাদেম ও ভক্তরা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। ওই সময় সকলে নিরব নিথর হয়ে বসে থাকতেন। তবে দুই বছর বাদ আসর ওই মজলিসে হযরত কুদ্দিসাসিররুহুকে আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর সাথে কালামে পাকের দাওর করতে দেখেছি। আব্বাজান ব্যতীত অন্য কারো সাথে হযরতকে দাওর করতে দেখিনি। অনুরুপভাবে বাদ মাগরিব নফল নামাযে হযরত কুদ্দিসাসিররুহু নিজে সোয়া পারা তিলাওয়াত করতেন। ১৩৪৫ হিজরী সনের রমযানুল মুবারকে বাদ মাগরিব এই পারা গোনার দায়িত্ব অধমের ওপর ন্যস্ত ছিল। অধমের সাথে হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ আব্দুল কাদের সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু এবং হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী কুদ্দিসাসিররুহুর মুহতারাম ভ্রাতা মাওলানা আলহাজ্ব সায়্যিদ আহমদ সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুও হযরতের পিছনে নামায পড়তেন। হযরত রায়পুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর শরীর ওই বছর খুব খারাপ ছিল, বিধায় বসে বসে নামাযে শরীক হতেন। কিন্তু হযরত কুদ্দিসাসিররুহু দুর্বলতা ও বার্ধক্য থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়াতেন। মিরাঠের জনাব হাফেয ফছীহুদ্দীন, হাজী ওজীহুদ্দীন, শায়েখ রশীদ আহমদ সাহেব মরহুমদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার ফলে হযরত কুদ্দিসাসিররুহু তাদের বাচ্চাদের কুরআন খতম অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার জন্য তথায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। হযরত যেহেতু ইতেকাফ করতেন তাই ২০শে রমযানের রাতেই বাচ্চাদের কুরআন খতম অনুষ্ঠান করতেন। হযরত কুদ্দিসাসিররুহু ১৯শে রমযানের ভোরে তথায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং ২০ তারিখ ভোরে তথা হতে ফিরে আসতেন। তাদের ওইসব অনুষ্ঠানে এভাবে অংশগ্রহণ করতেন যে, মসজিদে এশার ফরয পড়ে হুজরা শরীফে চলে যেতেন। আপন ঈমামের পিছে তারাবীহ পড়তেন। ও বিতর থেকে ফারেগ হয়ে মসজিদে বাচ্চাদের খতমে শরীক হতেন। খতমের দিন তো সাধারণতঃ একটু দেরী হয়েই থাকে তথাপি অনেক সময় শেষ চার রাকাতে হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর সুভাগমণের অপেক্ষা করা হত।

মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী লিখেছেন যে, ১৩৪৫ হিজরীতে বযলুল মাজহুদ সংকলণের কাজ শেষ হওয়ার পর তা সংকলনের জন্য যে সময় ব্যয় হত তার বেশীরভাগ সময় কালামে পাকের তিলাওয়াত ও "অফ-উল-অফা" নামক কিতাব অধ্যায়ন করে কাটাতেন। বাদ যোহর অন্দর মহলে আম্মাজী সাহেবাকে কালামে পাক শোনাতেন। পর্দার খাতিরে অধম সেখানে যেতে পারতামনা। তখন মৌসুম ছিল খুব গরমের এবং পরিবারের বসবাসের জন্য শুধু একটি তলাই ব্যবহার করা হত। নীচের তলা পাকশাক ও খাদেমদের থাকার জন্য ছিল। মাওলানা মিরাঠী লিখেছেন, ব্রেণের এত পরিশ্রমের পরও এই দুর্বল শরীর নিয়ে তিলাওয়াতে কালামে পাকের জন্য এ ধরণের কষ্ট করছেন দেখে মাওলানা সায়্যিদ আহমদ সাহেব ও মৌলবী যাকারিয়া কয়েকবারই হযরতের খেদমতে আরজ করেছিলেন, হযরত ব্রেণের দিকেও কিছু খেয়াল করা দরকার। হযরত ব্রেণকে অনেক বেশী ব্যতিব্যস্ত রাখেন। কিন্তু হযরত বলতেন, ব্রেণের আর কি কাজইবা বাকী আছে? যে তার কারণে একটু হিসাব করে চলবো। একবার বললেন, দুর্বলতার প্রভাব স্মরণ শক্তির ওপর পড়ে। তাই ভয় হয়, কালামে পাক ভুলে না যাই। এজন্য কালামে পাক তিলাওয়াতের প্রতি এতো গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আরেকদিন বললেন, ব্রেণ থাক বা যাক তাতে আসে যায়না, তবে কালামে পাক ছাড়া যাবে না।

হযরত কুদ্দিসাসির্‌রুহু জীবনের শেষ রমযানের অবস্থা তো বলে বোঝানো মুশকিল। এক পেয়ালা সাদা চা আর একটি চাপাতি রুটির অর্ধেক; এই ছিল হযরতের খোরাক। কুরআন পাক তিলাওয়াত করা ও শোনার পেছনে হযরতের পরিশ্রম আরো বেড়ে গেল। সকালে সোয়া পারা হেফয্ শোনাতেন। পরে যোহর হতে আসর পর্যন্ত কখনো দেখে দেখে আবার কখনো মুখস্থ একটানা পড়তে থাকতেন। বাদ মাগরিব যাকারিয়াকে আওয়াবীন নামাযে সোয়া পারা শোনাতেন। পরে মসজিদে নববীর হেরেমে এশার নামায পড়ে মাওলানা সায়্যেদ আহমদ সাহেবের মাদরাসায় তাশরীফ নিয়ে আসতেন এবং কেরাত ও তাজবীদ বিভাগের শিক্ষক কারী মুহাম্মাদ তাওফীক সাহেবের পিছনে তারাবীহ পড়তেন। তিনি অত্যন্ত ধীরে সুস্থে তারাবীতে দুই পারা পড়তেন। নামায শেষ হতে আরবী সময়ের পাঁচটা বেজে যেত। অর্থাৎ হিন্দুস্তানে সোয়া বারোটার সময় যতটা রাত্র হয়। এরপর আরবী সময় ছয়টার দিকে শুয়ে যেতেন।

মৌলবী যাকারিয়াকে বলে রেখেছিলেন যে, আরবী আটটার সময় আমাকে জাগিয়ে দেবে। মৌলবী যাকারিয়া বলেন, সারা রমযানে এক দুই বার হযরতকে জাগানো প্রয়োজন হয়েছে। অন্যথায় আটটার সময় গিয়ে হযরতকে অযু অথবা এস্তেঞ্জা করতে দেখেছি। এই সময় হযরত দুই পারা কুরআন তিলাওয়াত শোনাতেন। হযরত কুদ্দিসাসির্‌রুহু ইমাম নাফের কেরাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ শোনার খুব আগ্রহ ছিল। তাই মাদ্রাসার দুই জন ছাত্র এক এক পারা করে হযরতকে ইমাম নাফের কেরাতে কালামে পাক শোনাতেন। ২৭শে রমযানের রাতে হযরত তীব্রজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিছু প্যারালাইসিসের ভাবও প্রকাশ পায়। অসুস্থতার এই ধারা মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। এর আগে ১৩৩৮ হিজরীতে আরব ভূমি সফরকালে জাহাজে থাকতেই রমযানের চাঁদ দেখা যায় জাহাজে মাথা ঘোরা ও দুর্বলতার কারণে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হযরত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তারাবীহে কালামেপাক শোনা ও শোনানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ওই সফরে মৌলবী যাকারিয়াও সাথে ছিলেন। প্রথম আট রাকাতে হযরত আধা পারা এবং বাকী বার রাকাতে মৌলবী যাকারিয়া পৌনে এক পারা শোনাতেন। রমযানের দশ তারিখে তারা মক্কায় পৌছে যান। সেখানে এক ক্বারী সাহেবের পেছনে হযরত তারাবীহ পড়েন এবং নিজের তারাবীহের খতম নফল নামাযে পূর্ণ করেন। ওই সফরে তারা ঠিক মাগরিবের সময় জাহাজ থেকে জেদ্দায় অবতরণ করেন। ক্লান্তির অবস্থা এত ছিল যে, তারাবীহ তো দূরের কথা দাঁড়িয়ে ফরয নামায পড়াও কঠিন হয়ে পড়েছিলো। এতদসত্ত্বেও হযরত কুদ্দিসাসির্‌রুহু ওই রাতে তারাবীর কিছু অংশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কিছু অংশ বসে বসে পড়ে নিলেন। হযরত কুদ্দিসাসির্‌রুহুর কি আশ্চর্য হিম্মত, হযরতের বাহ্যিক গুণাবলীর কিছুটা বর্ণনা দেয়া সম্ভব হলেও তার খোদাপ্রদত্ত ওইসব নেয়ামতের বর্ণনা দেয়ার মত ভাষা নেই, যা চিন্তা শক্তিকে নিস্তব্ধ ও বাক শক্তিকে নির্বাক করে দেয়। (তাযকেরাতুল খলীল)

আপ্‌বীতীর চতুর্থ খন্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বালিশ হতে মাথা উঠানোও কষ্টকর হয়ে যেত। অল্প বয়স সত্ত্বেও এ অধমের অবস্থাও প্রায় তেমনই ছিল। তদুপরি বমি ও দাস্তের আক্রমণও প্রবল ছিল। জাহাজের দুর্গন্ধ, বিশেষ করে যখন পেট্রোল ঢালা হত তখন সারা জাহাজে মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। ফলে এ অধমের মাথা ঘোরার পাশাপাশি দাস্তও খব

বেশী হত। এ অবস্থায় রমযান এসে গেল। ২৯শে শাবান হযরত আমাকে বললেন কি ভাই! তারাবীর কি ব্যবস্থা করা যায়? আমি বললাম হযরত মাথা ঘোরার কষ্ট না হয় সামলে নেয়া গেল, কিন্তু এই বমির মধ্যে কিভাবে তারাবীহ পড়া যাবে? হযরত বললেন, বমিতে কি হবে? বমি হয়ে গেলে অযু করে নিবে।

বার্ধক্য, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, তদুপরি জাহাজটি ছোট ছিল বিধায় নড়া চড়া করত বেশী। এত সবকিছু সত্ত্বেও সমস্ত তারাবীহ হযরত দাঁড়িয়ে পড়তেন। জেদ্দা পৌছার পর এত ক্লান্ত ও কাহিল হয়ে পড়লেন যে, দাঁড়ানো মোটেও সম্ভব হচ্ছিল না। যেমনটি মাওলানা মিরাঠীর কথা ওপরে বলা হয়েছে। হাজী মকবুল আহমদ সাহেবকে আল্লাহপাক মাগফিরাত করুক, তিনি রাগ হয়ে আমাকে বললেন, ভক্তির চোটে এই বৃদ্ধকে নিয়ে যেন আবার দাঁড়িয়ে যেওনা। তার দুর্বলতার প্রতিও একটু খেয়াল রেখ। এ সফরের সমস্ত দায় দায়িত্ব ছিল হাজী সাহেবের ওপর। ভয় হচ্ছিল, তিনি অধমকে সফর থেকে বাদ দিয়ে দেন কিনা। অন্যদিকে খাওয়ার সময় হযরতের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভও হাজী সাহেবের দয়ার ওপর নির্ভর করত। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল হযরতকে যেন বলে দেই, আজ তারাবীহ পড়ার হিম্মত হচ্ছে না এভাবে সরাসরি বলে দেয়া তো সম্ভব হয়নি, তবে হযরত যখন বললেন, ভাই যাকারিয়া! কি অবস্থা? তখন আমি হাজী সাহেবের ভয়ে এতটুকু বলেছিলাম, হযরত! ক্লান্তি বড় বেশী। কিন্তু পরে যখন হযরত কুদ্দিসা সিররুহুকে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে পুরো তারাবীহ আদায় করতে দেখলাম তখন আমার দুঃখ ও লজ্জার আর অন্ত থাকল না। আমি হযরতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর নিজের ওপর দুঃখ ও লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, হায়! কেন এমন করলাম, কেন হাজী সাহেবের ভয়েই এমন জবাব দিতে গেলাম! বার বার খেয়াল হচ্ছিলো হযরতকে গিয়ে বলি শুধু হাজী সাহেবের ভয়ে এমন জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু হাজী সাহেব মরহুমের ভয়ে এই সাহস হচ্ছিল না। আমার খুব মনে আছে, নামাযের মধ্যে দুই তিন বার হযরতের নিকটে গিয়েও ছিলাম এবং এটা বলতে চাচ্ছিলাম যে, হযরতের দুর্বলতার প্রতি খেয়াল করেই ওযর দেখিয়েছিলাম। কিন্তু হাজী সাহেবের ভয়ই জয়ী হল। তিনি নারাজ হবেন ভেবে কিছুই আর বলা হল না। ফলে সেই দুঃখ ও লজ্জা আজও রয়ে গেল।

কুতুবে আলম হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররুহুর মা'মূলাত

"আপবীতী"র চতুর্থ খন্ড লেখার সময় বুযুর্গানে দ্বীনের রিয়াযত ও মুজাহাদার বর্ণনায় আ'লা হযরত কুতুবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী কুদ্দিসাসিররুহুর মাহে রমযানের মা'মূলাত উল্লেখ করা হয়েছে। পরে খেয়াল হল চলমান পুস্তিকাটির বিষয়বস্তুর সাথে তার মিল রয়েছে বিধায় এখানেও তা উল্লেখ করা হোক। আপবীতীর ষষ্ঠ খন্ডে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী কুদ্দিসাসিররুহুর মুজাহাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছি যে, হযরতের রিয়াযত মুজাহাদার অবস্থা এমন ছিল যে, দেখলে কষ্ট লাগত, দয়া হত। বার্ধক্যে হযরতের বয়স যখন সত্তরের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে তখন তার ইবাদতের আধিক্যের অবস্থা এই ছিল যে, সারাদিন রোজা রাখতেন এবং বাদ মাগরিব ছয়ের পরিবর্তে বিশ রাকাত আওয়াবীন পড়তেন। এতে কমপক্ষে দুই পারা তিলাওয়াত করতেন। পাশাপাশি রুকু সিজদা এত লম্বা হত যে, দেখলে মনে হত, হযরত নামাযের কথা ভুলে গেছেন। নামায শেষে বাড়ী যেতেন এবং খানা খাওয়া পর্যন্ত কয়েক পারা তিলাওয়াত করে ফেলতেন। কিছুক্ষণ পর আবার এশা ও তারাবীর নামাযের সময় হয়ে যেত। এতেও কমপক্ষে এক ঘন্টা সোয়া ঘন্টা সময় লেগে যেত। তারাবীহ শেষে সাড়ে দশটা কি এগারটার দিকে আরাম করতে যেতেন এবং দুইটা আড়াইটার দিকে অবশ্যই উঠে যেতেন। অনেক সময় খাদেমরা একটার সময়ও হযরতকে অযু করতে দেখেছেন। তখন আড়াই তিন ঘন্টা তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দিতেন। অনেক সময় খাদেমরা পাঁচটার সময় সাহরী নিয়ে হাজির হয়ে দেখতেন, তখনও হযরত নামাযেই আছেন। বাদ ফজর আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত যিকির আযকার, অযীফা ও মুরাকাবায় মগ্ন থাকতেন। অতঃপর ইশরাক পড়ে কিছুক্ষণ আরাম করতেন। এর মধ্যে ডাক পিয়ন এসে গেলে প্রয়োজনীয় চিঠি পত্রের জবাব দিতেন, জরুরী ফতোয়া ও মাসয়ালা লেখাতেন। অতঃপর চাশতের নামায পড়ে কায়লূলা করতেন। বাদ যোহর হুজরার দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়া হত। তখন থেকে আসর পর্যন্ত তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। এটা ওই রমযানের কথা বার্ধক্য ও দুর্বলতা ছাড়াও যখন হযরতের কোমরে এত তীব্র ব্যাথা ছিল যে, হুজরা হতে ইস্তিঞ্জা খানার দূরত্ব ছিল মাত্র ষোল কদমের

পথ, সেখানে যেতেও পথিমধ্যে একবার বসে পড়তে হত। এত কষ্ট সত্ত্বেও ফরয তো ফরযই নফল নামাযও হযরতকে বসে পড়তে দেখা যায়নি। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন। খাদেমরা বারবার বলত, আজকের তারাবীহ বসে বসে পড়লে ভাল হবে। কিন্তু তিনি জবাব দিতেন, না জ্বী, এ যে বড় কম হিম্মতের কথা।

কি আর্শ্চয হিম্মত? আর কেনইবা হবেনা, নবীজী (সাঃ) বলেছিলেন, আমি কি শোকর গুজার বান্দা হব না ? নবীজীর ওই বাণীর মর্যাদা রক্ষা করা তাঁর উত্তরাধিকারীদের পক্ষে এমন হিম্মত ও খোদার রাহে চলার দুর্জয় সাহস ব্যতীত সম্ভব ছিল না। রমযান মাসে হযরতের সব আমলই বেড়ে যেত, কিন্তু বিশেষ ভাবে তিলাওয়াতে কালামে পাকের মাত্রা এত বেড়ে যেত যে, মসজিদ থেকে বাড়ী আসা যাওয়ার পথেও কারো সাথে কথা বার্তা বলতেন না। নামায ও নামাযের বাহিরে প্রত্যেক দিন অর্ধ খতম কুরআন শরীফ পড়া তার দৈনন্দিনের আমলে পরিণত হয়েছিল। প্রথম রোজার দিন সকলকে বলে দিতেন, আজ থেকে মজলিস মুলতবী হয়ে গেল। রমযানের মত মূল্যবান মাসকে কেউ নষ্ট করে দিলে, এটা হবে বড়ই অনুতাপের কথা। এত মুজাহাদা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও খোরাক এত কম ছিল যে, সারা রমযান মিলে পাঁচ সের আনাজও খেতেন কিনা সন্দেহ।

তাযকেরাতুল রশীদে'র অন্য এক স্থানে হযরতের রমযান মাসের মা'মূলাত সম্পর্কীয় হযরতের অন্যতম খলীফা হাকীম ইসহাক সাহেব নাহ্টুরীর একটি লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত হাকীম সাহেব লেখেন, রমযান শরীফের সকালে হুজরা শরীফ থেকে অনেক দেরীতে বের হতেন। শীতকালে সাধারণত দশটার দিকে বাইরে তাশরীফ আনতেন। নফল নামায, তিলাওয়াতে কালামে পাক, মুরাকাবা ইত্যাদির মাত্রা অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে যেত। শোয়া ও আরাম করার সময় কম হয়ে যেত। কথাও খুব কম বলতেন। বাদ মাগরিব কিছুক্ষণ নির্জনতার মজা উপভোগ করে খানা খেতে যেতেন। প্রথম জীবনে বিশ রাকাত তারাবীহ নিজেই পড়াতেন। শেষ জীবনে এসে সাহেবজাদা মৌলবী হাফেয হাকীম মুহাম্মাদ মাসউদ আহমদ সাহেবের পিছনে পড়তেন। বিতরের পর লম্বা দু'রাকাত নামায কখনো দাঁড়িয়ে কখনো বসে আদায় করতেন। দীর্ঘক্ষণ কিবলামুখী হয়ে কি যেন পড়তে থাকতেন। অতঃপর একটি তিলাওয়াতে সিজদা করে উঠে যেতেন। কিছু কিছু শব্দ শুনে বান্দার ধারণা হল যে, ওই

সময়টায় তিনি সূরা "তাবারাকাল্লাযী" সূরা "সাজদা" এবং সুরা "আদ" তিলাওয়াত করতেন। অধিকাংশ সময় যিলহজ্জ মাসের পুরো নয়দিন, আশুরা এবং পনের শাবানের রোযাও রাখতেন।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর জীবনের শেষ তারাবীহ

আমার আব্বাজান এ ঘটনা অনেক বার শুনিয়েছেন যে, হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর জীবনের শেষ রমযানে তারাবীতে কালামে পাক শোনানোর সুযোগ আমার হয়েছিল। কারণ, হযরত গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর সাহেবজাদা হাকীম মাসউদ সাহেব রহ. কোন ওযরের কারণে সে বছর তারাবীতে কালামে পাক শোনাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। আব্বাজান বলতেন, হযরত ইমামে রব্বানী কুদ্দিসাসির্‌রুহু মাহে মুবারকের কয়েকদিন পূর্ব থেকে একথা বলা শুরু করলেন, এ বছর আমাদের তারাবীহ কে পড়াবে? মাসউদ আহমদ তো অপারগ। আব্বাজান বলেন, হযরতকে বার বার একথা বলতে শুনতাম, কিন্তু আদবের খেয়ালে একথা বলতে হিম্মত হত না যে, হযরত! আমিই পড়িয়ে দিবো ইনশা–আল্লাহ। রমযানের দু'দিন পূর্বে হযরত আমাকে সরাসরি বললেন মৌলবী ইয়াহইয়া! তুমিও তো হাফেয, আমি বললাম, হযরত! হাফেয সত্য তবে আমি যে ফারসীতে কুরআন পড়ি। অথচ হযরত ওয়ালা হাকীম সাহেবের পড়া শুনে অভ্যস্ত, আর তিনি একজন চমৎকার কারীও বটে। হযরত কুদ্দিসাসির্‌রুহু বললেন - কেন তোমার পড়াতো আমি শুনেছি। ব্যস এ বছর তুমিই তারাবীহ পড়িয়ে দিও। আব্বাজান বলতেন, প্রথম দিনটা আমার কাছে খুব ভারী বলে মনে হচ্ছিল। সারা দিন সোয়া পারা দেখে দেখে পড়লাম। সাত বছর বয়সে কুরআন পাক হিফ্য করার পর প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত প্রতি দিন এক খতম দেখে দেখে পড়তাম বটে, তবে এরপর থেকে আর দেখে পড়ার প্রয়োজন হয় নি। আব্বাজান বলেন। প্রথমদিন সোয়া পারা দেখে দেখে পড়লাম। দ্বিতীয় দিন হতে সব ভয় দূর হয়ে গেল। সারা রমযানে আর কখনো দেখে পড়ার প্রয়োজন হয় নি।

আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর কাছে কুরআন পাক মুখস্থ পড়ার প্রতি এত তাকিদ ছিল যে, সম্ভবত কোথাও লিখে এসেছি, তিনি তার কুতুব

খানার প্যাকেট ইত্যাদি নিজ হাতেই বাঁধতেন, ঠিকানাও নিজ হাতে লিখতেন এবং তখন আওয়াজ করে কুরআন পাক তিলাওয়াত করতে থাকতেন। কোথাও আটকাতেন না। মাওলানা আশেক এলাহী সাহেব কালামে পাক শোনাতে মিরাঠ তাশরীফ নিয়ে এসেছিলেন। দেখতাম চলাফিরার মধ্যে সারাদিনের ভেতর তিনি কুরআন পাক খতম করে ফেলতেন। ইফতারের সময় হলে তার জবান থেকে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ শব্দ পাওয়া যেত। যখন তিনি ট্রেনে করে মিরাঠ পৌছলেন তখন ইশার সময় হয়ে গেল। সব সময় অযুর সাথে থাকার অভ্যাস ছিল, তাই মসজিদে কদম রেখেই মুছল্লায় চলে গেলেন এবং তিন ঘন্টায় দশ পারা পড়লেন। এত পরিস্কার ও চালু পড়লেন যে, মনে হচ্ছিল সামনে কুরআন শরীফ খুলে রেখে নির্বিঘ্নে ধীরে পড়ে যাচ্ছেন। এভাবে তিন দিনে খতম শেষ করে চলে গেলেন। কোন হাফেযের সাথে দাওর করা বা শ্রোতা হিসেবে কোন হাফেযকে পিছে রাখার প্রয়োজন হয়নি।

মিরাঠের এ সফর সম্পর্কে আব্বাজান বলতেন, মিরাঠের লোকদের কাছে শুনেছি, সেখানকার লোকজন যখন জানতে পারল যে, সাহারানপুর থেকে এক ব্যক্তি মাত্র তিনদিনে কুরআন শোনানোর জন্য আসতেছে তখন ত্রিশ চল্লিশ জনের মতো হাফেয শুধু পরীক্ষা করার জন্য আমার পেছনে তারাবীহ পড়তে এসেছিল।

রমযান এলে; আব্বাজানের আমার ন্যায় জ্বর আসত না। দোস্তদের অনুরোধে এক দু'দিনের জন্য তাদের ওখানে চলে যেতেন এবং দুই অথবা তিন রাতে তারাবীতে পূর্ণ কুরআন খতম করে চলে আসতেন। মসজিদে পড়ালে সাধারণতঃ তিন রাতে খতম করতেন। আর মসজিদ ছাড়া কারো বাড়ীতে পড়ালে এক বা দু'রাতের মধ্যেই খতম হয়ে যেত। (বহাটের) আমীর শাহ যাহেদ হাসান সাহেব মরহুমের অনুরোধে একবার তার বৈঠক খানায় মাত্র দুই রাতে পুরা কুরআন শরীফ শুনিয়ে ফিরে এসেছিলেন। দিল্লীর করাবপুর নওয়াব ওয়ালতকীর মসজিদে তারাবীতে কুরআন খতমের ঘটনা আমার আজও মনে পড়ে। মৌলবী নাসীরুদ্দীন একদা হাকীম ইসহাক সাহেব মরহুমের মসজিদে কুরআন শোনাচ্ছিলেন। আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু সেদিন সবেমাত্র এক সফর থেকে ফিরে এসেছেন। হাকীম ইসহাক সাহেবের বৈঠক খানায় একটু আরাম করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। নাসীরুদ্দীনের তখন চৌদ্দ নম্বর পারা চলছিল, পিছনের

হাফেযরা বার বার তাকে লোকমা দিচ্ছিল। আব্বাজান অযুর সাথে ছিলেন। মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সালাম ফিরানোর পর নাসীরুদ্দীনকে মুছল্লা থেকে সরিয়ে দিলেন এবং ষোল রাকাতে ষোল পারা খতম করলেন আনন্দ তার ওপর জয়ী হয়েছিল। বার তারিখের রাত্রে কুরআন খতম করতে পেরে সব কষ্টের কথা তারা ভুলে গিয়েছিল।

কয়েকজন আত্নীয়ের অনুরোধে (আম্মী-বীর) ঘরে আমার আব্বাজানের নানী এবং হযরত মাওলানা মুজাফফার হুসাইন সাহেবের কন্যা। তার আসল নাম ছিল আমাতুর রহমান। (কিন্তু আম্মী-বী নামে ই তিনি পরিচিত ছিলেন) শেষ জীবনে একবার কুরআন শরীফ শোনানোর কথা আমার মনে আছে এবং যৌবনের কাহিনী শোনাতে গিয়েও আব্বাজান বলতেন, নফল নামাযে কুরআনে পাক শোনাতে শোনাতে সারারাত কেটে যেত। আর যেহেতু আমাদের এখানে নফল নামাযের জামাতে চারজনের বেশী শরীক হওয়ার অনুমতি ছিল না, তাই মহিলা মুক্তাদিগণ বদলাতে থাকত, কিন্তু আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু নিরবিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়াতে থাকতেন। আম্মীবীর কারণে চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুকেও কোন কোন রমযানে কান্ধলায় থাকতে হত। তারাবীহ শেষ হতে প্রায় সারারাত লেগে যেত। মসজিদে ফরয আদায় করে অন্দর মহলে চলে যেতেন এবং সাহরী পর্যন্ত তারাবীতে চৌদ্দ পনের পারা পড়তেন।

আব্বাজান আপন মামা ও আমার প্রথম স্ত্রী মরহুমার ওয়ালেদ মুহতারাম মাওলানা রউফুল হাসান সাহেব রহ.এর বিস্তারিত ঘটনা তো আপবীতীর ষষ্ঠ খণ্ডে তাকওয়ার বর্ণনায় আসবে। এখানের সাথে মিল থাকার কারণে তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে। ত্রিশ রমযানের রাত্রে 'আলিফ লাম মীম' হতে: قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পর্যন্ত এক রাকাতে আর আরেক রাকাতে' قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়ে সাহরীর সময় দু'রাকাত শেষ করে স্বীয় মাতা আম্মীবী কে বলতেন, বিশ রাকাতের দু'রাকাত আমি পড়িয়ে দিলাম বাকী আঠারো রাকাত আপনি পড়ে নিন। আশ্চর্য কথা হচ্ছে যে, আম্মীবী সারারাত দাঁড়িয়ে কুরআনে পাক শুনতে থাকতেন।

হযরত আকদাস কাসেম নানুতবী কুদ্দিসা সির্রুহু

হযরতুল আকদাস মাওলানা কাসেম নানুতবী কুদ্দিসা সির্রুহুর মাহে মুবারকের বিস্তারিত মা'মূলাতের সন্ধান লাভে তো সক্ষম হইনি এবং এখন এমন কেউ বেচে নেই যার থেকে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে, তবে এতটুকু কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ১২৭৭ হিজরীতে মক্কা-মদীনা সফরকালে রমযান মাসে কুরআনপাক মুখস্থ করেছিলেন। দিনে এক পারা মুখস্থ করতেন, আর রাতে তারাবীতে তা শোনাতেন। তবে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব "নানুতবী সাওয়ানেহে কাসেমী" নামক জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, ১২৭৭ হিজরীর জুমাদাস্ সানী মাসে হযরত হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে জিলকদ মাসের শেষ দিকে মক্কা মুকাররমায় পৌছান। হজ্বের পর মদীনা শরীফে রওযায় আকদাসেও হাজিরী দেন এবং সফর মাসে মদীনাপাক থেকে ফিরে আসেন। রবীউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে বোম্বাই পৌছেন এবং জুমাদাস্ সানী মাসে বাড়ী ফিরে আসেন। যাওয়ার সময় করাচি হতে পালটানা জাহাজে গিয়েছিলেন। রমযানের চাঁদ দেখার পর তিনি কুরআনে পাক মুখস্থ করা শুরু করেন এবং সেখানেই শোনাতে থাকেন। রোযার পর "মুকাল্লা" পৌছে হালুয়া মিষ্টি কিনে বন্ধু বান্ধবদের মাঝে কুরআন খতম উপলক্ষে বিতরণ করেন। হযরত কুরআনে পাক মুখস্থ করেছেন এ কথাটি কারো কাছে প্রকাশ পায়নি। খতমের পর বলতেন, শুধু দুই বছরের রমযানেই আমি কুরআনে পাক হিফয করে নিয়েছি। যখন হিফয করতাম তখন প্রতিদিন সোয়া পারা বা আরো কিছু বেশী হিফয করতাম। হিফয করার পর কুরআনে পাক খুব বেশী বেশী করে তিলাওয়াত করতেন। একবারের কথা মনে আছে, এক রাকাতে তিনি সাতাইশ পারা পড়েছিলেন। তার পিছে কেউ ইকতিদা করলে সালাম ফিরানোর পর তাকে নিষেধ করে দিতেন এবং একা একা সারা রাত নামায পড়তে থাকতেন। (সাওয়ানেহে কাসেমী)

প্রসিদ্ধ উক্তি এবং হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, প্রথম রমযানে সোয়া পারার আরো কিছু বেশী মুখস্থ করে খতম শেষ করেন।

সায়্যিদুত্ তায়েফা হযরত আলহাজ্ব ইমদাদুল্লাহ সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু

হযরতের মাহে মুবারকের মা'মূলাত "ইমদাদুল মুশতাকে"র মধ্যে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু এভাবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত হাজী সাহেব বলতেন, তোমাদের তালীমের জন্য বলছি, এ ফকীর যৌবনের অধিকাংশ রাত অনিদ্রায় কাটিয়েছে। বিশেষ করে মাহে মুবারকের রাতে তো শোয়ার সুযোগই হত না। হাফেয জামেন সাহেবের নাবালক পুত্র হাফেয ইউসুফ এবং আমার নাবালক ভাতিজা হাফেয আহমদ হুসাইন বাদ-মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত প্রত্যেকে সোয়া পারা করে আমাকে শোনাতো। বাদ-ইশা আরো দু'জন হাফেয কুরআন শোনাতো। পরে অর্ধেক রাত পর্যন্ত আরেকজন এবং তাহাজ্জুদে আরো দু'জন হাফেয এ ফকীরকে কুরআনপাক শোনাত। মোটকথা সারারাত এভাবে কেটে যেত। (ইমদাদুল মুশতাক)

আ'লা হযরত শাহ আব্দুর রহীম সাহেব রায়পুরী রহ.এর মা'মূলাত

তাযকেরাতুল খলীলে হযরতের মাহে মুবারকের মা'মূলাত এভাবে লেখা হয়েছে যে, কুরআনে পাক শিক্ষার প্রতি হযরতের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। দুনের আশেপাশের অনেক গ্রামে তিনি বহু মকতব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নিজেরও তিলাওয়াতে কালামে পাকের প্রতি ইশক ছিল। তিনি হাফেয ছিলেন। প্রায় পুরো রাত তিলাওয়াতে কাটিয়ে দিতেন। চব্বিশ ঘন্টায় এক ঘন্টার বেশী ঘুমাতেন না। তিনি মানুষ দেখলে অস্থির হয়ে পড়তেন। তাদের সঙ্গ হতে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। কারণ, এতে কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য মা'মূলাত আদায়ে সমস্যা হত। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টা আম দরবার ও মুলাকাতের জন্য ধার্য ছিল। সকাল নয়-দশটার দিকে এক ঘন্টা সময় মেহমানদের সাথে সাধারণ সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এছাড়া বিশেষ কোন জরুরত ছাড়া কারো সাথে সাক্ষাত করতেন না। হুজরা শরীফের দরজা বন্ধ করে দিয়ে

নির্জনতার মজা লুটতেন এবং স্বীয় মাওলায়ে কারীমের সাথে প্রেমালাপে মগ্ন হয়ে যেতেন। এমনিতেই তার খোরাক ছিল খুবই কম। তার পর মাহে মুবারকে রিয়াযত মুজাহাদার পরিমাণ এত বেড়ে যেত যে, তা দেখলে দয়া হত। মাহে মুবারকে সকালের ও বাদ আসরের মজলিস মুলতবী করে দেয়া হত। ইফতার ও সাহরী উভয় মিলে তাঁর খোরাক ছিল দু'কাপ চা এবং একটি বা অর্ধেক চাপাতি রুটি। প্রথম জীবনে তিনি নিজেই তারাবীতে কুরআনে পাক শোনাতেন। তারাবীহ শেষ হতে হতে দুই কি আড়াইটা বেজে যেত। শেষ জীবনে যখন মস্তিষ্কের দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন অন্যের পিছনে তারাবীহ পড়তেন। নিজে তিলাওয়াত করা ছাড়াও অন্যের থেকে তারাবীতে তিন চার খতম শুনতেন। মাহে মুবারকের সারাদিন ও সারা রাত তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। এজন্য মেহমানদের আগমনও তিনি বন্ধ করে দিতেন। মাহে মুবারকে হযরতের এখানে মেহমানদের ভিড় খুব বেড়ে যেত। তবে সাক্ষাত একদম বন্ধ থাকত। হযরত যখন নামাযের জন্য বের হতেন তখন দূর থেকেই তারা যেয়ারত করে মনের আশা মিটাতেন। মাহে মুবারকে চিঠি পত্রের আদান-প্রদানও বন্ধ থাকত। ঈদের পূর্বে কারো চিঠি পত্র খোলা হত না। ইল্লা মা-শা-আল্লাহ। আল্লাহপাকের যিকির যেন তাঁর খোরাক বনে গিয়েছিল। এতে তাঁর শক্তি এতো বৃদ্ধি পেত যে, তার সামনে দাওয়াউল মিস্‌ক জাওয়াহিরে মহরা ইত্যাদি শক্তি বর্ধক বড়িরও কোন তুলনা চলেনা। (তাযকেরাতুল খলীল)

ওপরে বলা হয়েছে যে, আ'লা হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর এখানে মাহে মুবারকে মেহমানদের ভিড় বহু বেড়ে যেত। তবে এসব মেহমান তাঁরাই হত যারা ছিলেন হযরতের খাঁটি প্রেমিক ও আল্লাহপাকের যথার্থ আশেক। কারণ, তাঁদের জন্য মুলাকাতের কোন সুযোগ ছিল না। নামাযে আসা যাওয়ার পথে ভক্তরা দূর থেকে যেয়ারত করে নিতেন। বিশেষ বিশেষ মেহমান যাদের জন্য হযরতের সময় ব্যয় করতে হত, তাঁদের আগমণ হযরতের কাছে বোঝা মনে হত।

আপ্‌বীতীর চতুর্থ খন্ডে "বাবু তাহদীস-বি-নিয়ামত" জীবনের শেষ রমযানটি ১৩৩৪ হিজরীর রমযান আলা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর দরবারে অতিবাহিত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম। হযরত রহ. স্নেহভরে জবাব দিলেন, রমযান মাস কোথাও ঘোরাফিরা করা বা কারো সাথে সাক্ষাত করার মাস নয়। আপন জায়গায় বসে একাগ্র চিত্রে কাজ করতে থাক। পরে অধম

শেষ দশ দিনের অনুমতি চেয়ে পুণরায় পত্র লিখলে হযরত যে জবাব দিয়েছিলেন পুরাতন কাগজ পত্রের ফাইলে তা এখনো বিদ্যমান রয়েছে এবং আপ্‌বীতী চতুর্থ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত লিখেছিলেন, নিষেধের যে কারণ মাসের শুরুতে ছিল মাসের শেষেও তা রয়েছে। বাকী তুমি ও তোমার পিতার কথা আলাদা। তোমরাতো শক্তিশালী। তোমাদের সামনে আমাদের মত গরীবদের কি কোন জোর চলতে পারে? এটা তোমাদের জবরদস্তী যে, মাহে মুবারকেও তোমাদের চিঠির জবাব লিখছি। হযরত মাওলানা তোমাকে যে যিকির শোগল তালকীন করেছেন তা পালন করে যাওয়া উচিত। আব্বাজান আমাকে বললেন, তোমার কারণে হযরতের একাগ্রতার মধ্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে এবং তোমার খাওয়া দাওয়ার খেয়াল হযরতকে করতে হবে। তাই সেথায় গিয়ে হযরতকে কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন নেই।

হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু

হযরতের রমযানের মা'মূলাতের কিছু বর্ণনা ফাযায়েলে রমযানে'র মধ্যেও এসে গেছে। হযরত শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর "আসীরে মাল্টা" নামক পুস্তকে লেখেন, যেহেতু খুব অশান্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তায়েফে রমযান শুরু হল এবং নিরাপত্তা বলতে কোন জিনিস ছিলনা, তাই না দিনের বেলা চাহিদা মাফিক খাবার যোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল, আর না মসজিদে তারাবীহ পড়ার কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল। মসজিদে ইবনে আব্বাস রা. ছিল তয়েফের সবচেয়ে বড় মসজিদ। সেখানেও শুধু "আলাম তারা" দিয়েই তারাবীহ পড়া হচ্ছিল। এরপরও মুসল্লিদের সংখ্যা খুবই কম হত। অধিকাংশ মুসল্লি মহল্লার মসজিদ কিংবা নিজ বাড়ীতে তারাবীহ পড়ে নিতেন। সারাক্ষণ গোলা-গুলি চলত। হযরত মাওলানা পূর্বের অভ্যাস অনুপাতে প্রথম প্রথম মসজিদে ইবনে আব্বাসেই তারাবীহ পড়তে যেতেন। তবে যাওয়ার পথে যেহেতু গোলা-গুলির সম্মুখীন হতে হত, তাই ওই সমজিদে যাওয়া ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তদুপরি এক রাত্রে এ ঘটনা ঘটল যে, সবেমাত্র মাগরিবের নামায শেষ হল, সকলে সুন্নাত ও নফলে মশগুল ছিল, এমন সময় চতুর্দিক থেকে অন্ধকার নেমে আসল। তখন হঠাৎ করে বিদ্রোহী বেদুইনদের আক্রমন শুরু হয়ে গেল। মসজিদে ইবনে আব্বাস রা.এর ছাদ ও মিনারায়

তুর্কী সেনাদের একটি দল অবস্থান করছিল মসজিদের দরজায়ও তাদের মোর্চা ছিল। উভয় পক্ষ হতে মারাত্মক গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। বহুক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টির ন্যায় গোলাগুলি হতে থাকল। মসজিদের ভিতরেও লাগাতার গুলি এসে পড়ছিল। মসজিদে যারা উপস্থিত ছিলেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এক কোনে গিয়ে তারা আশ্রয় নিলেন। ওই রাতে তারাবীহ পড়া সম্ভব হয়নি। যে কয়জন ছিলেন তারা কোন মতে এশার ফরয পড়ে অবস্থা একটু শান্ত হলে আপন আপন বাড়ীতে চলে গেলেন।

এ ঘটনার পর দোস্ত-বন্ধুরা হযরতকে অনুরোধ করে বললেন, আপনি মসজিদে ইবনে আব্বাস রা. এ না গিয়ে বাড়ীর নিকটবর্তী যে মসজিদটি রয়েছে তাতেই নামায আদায় করে নিন পরে রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই হযরত ওই মসজিদে পড়তে থাকেন। ওই রমযানে শুধু "আলামতারা" দিয়েই তারাবীহ পড়া হয়েছিল। তারাবীর পর হযরত রহ. সাহরী পর্যন্ত মসজিদেই নফলে মগ্ন থাকতেন। মৌলবী ওযায়ের গুল এবং এ অধম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.। ওই মসজিদেই আলাদা আলাদাভাবে নফল নামায ও কুরআনে পাক তিলাওয়াত করে সময় পার করতাম। যেহেতু গরমের মৌসুম ছিল তাই তাড়াতাড়ি সাহরীর সময় হয়ে যেত। ঘরে ফিরে সাহরী পাক করা হত। সাহরীতে জর্দার ব্যবস্থা করা হত। সেথায় চিনি পাওয়া যেতোনা বিধায় চাউল ও চায়ে মধু ব্যবহার করা হত। কখনো পোলাও পাক করা হলে তা গোশত ছাড়াই পাক করা হত। তায়েফে তখন চাউল পাওয়াও খুব দুষ্কর ছিল। এক আনার রুটি আট আনায় পাওয়াও ভার ছিল। দিল্লীর জনৈক ব্যবসায়ী হাজী হারুন সাহেব মরহুম হযরতের জন্য হাদিয়া স্বরূপ কিছু ভাল জাতের চাউল পাঠিয়েছিলেন। ওই চাউলগুলো তখন খুব কাজ দিয়েছিল। তথায় আমরা প্রায় দু'মাস অবস্থান করেছিলাম। সবকিছুর মূল্য উর্ধ্ব গতি হওয়ায় এ অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দশ বারটি আশরাফী খেয়ে ফেলেছিলাম। (আসীরে মাল্টা)

হযরত মাওলানা আলহাজ্ব সায়্যিদ আসগর হুসাইন মিঞা সাহেব দেওবন্দী রহ. শায়খুল হিন্দের জীবন-চরিত সাওয়ানেহে শায়খুল হিন্দে লেখেন, মাহে মুবারকে হযরতের বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেত। দিন-রাত ইবাদতে ইলাহী ছাড়া হযরতের অন্য কোন কাজ থাকতনা । দিনে কিছু আরাম করতেন সত্য, তবে সারা রাত নফল নামাযে কুরআনে পাক শুনতে থাকতেন। হযরত শায়খুল হিন্দ কুদ্দিসা সিররুহু নিজে হাফেয ছিলেন না।

নামাযে কালামে পাক শোনানোর জন্য বেশ কিছু হাফেয ঠিক করে রাখতেন। তারা দেওবন্দের বাহিরের হলে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাসহ সমস্ত ব্যয় ভার তিনি বহন করতেন। অনেক সময় আপন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আহমদ সাহেবকেও খোশামোদ তোশামোদ করে কয়েক খতম কুরআন শরীফ শুনে নিতেন। কখনো নিজের অন্তরঙ্গ দোস্ত ও পীর ভাই হাফেয আনওয়ারুল হক সাহেব মরহুমকে আবার কখনো নিজের ছোট ভাই মৌলবী মুহাম্মাদ মুহসিন সাহেবকে বা স্নেহের ভাগ্নে হাফেয মৌলবী মুহাম্মাদ হানীফ সাহেবকে কুরআন শোনানোর জন্য নিযুক্ত করতেন। জীবনের শেষ দিকে এসে অধিকাংশ সময় মৌলবী কিফায়েতুল্লাহ সাহেব এ খেদমত আঞ্জাম দিতেন।

তারাবীহ শেষে অনেকক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত লোকদের সাথে দ্বীনী আলোচনা করতেন। অনেক সময় আকাবির বুযুর্গদের কাহিনী শোনাতেন। এর পর সুযোগ হলে কয়েক মিনিট আরাম করতেন। তারপর শুরু হয়ে যেত নফল। দু'চার পারা শুনিয়ে এক হাফেয আরাম করতে চলে যেত। দ্বিতীয় আরেকজন আসত, আর হযরত ওই ভাবেই স্থির থাকতেন। কয়েকজন হাফেয পালাক্রমে হযরতকে কয়েক পারা করে শোনাতে থাকত। হাফেয পরিবর্তন হত, কিন্তু মাওলানা একই অবস্থায় থাকতেন। এভাবে কোন কোন রমযানে এটাও করতেন যে, মসজিদে ফরয আদায় করে বাড়ী চলে আসতেন এবং খাদেম ও ভক্তদের নিয়ে সেখানে জামাতসহ তারাবীহ পড়তেন। লম্বা সময় তারাবীতে ব্যয় করতেন। কোনদিন ছয় পারা কোনদিন দশ পারা পড়া হত। তারাবীহের পর পুনরায় নফল শুরু হয়ে যেত। সারারাত এর মজা উপভোগ করতে থাকতেন। দীর্ঘক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে যখন পা ফুলে যেত, তখন খাদেম ও ভক্তরা কষ্ট পেতেন ঠিকই কিন্তু حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা মুবারক ফুলে যেত। অনুসরণ হচ্ছে ভেবে মনে মনে তিনি খুব আনন্দিত হতেন।

একবারকার রমযানে অল্প খানা অল্প ঘুম তদুপরি নামাযে দীর্ঘ কিয়ামের দরুণ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। পা খুব ফুলে গেল। কিন্তু মনের বাসনা তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। প্রচুর পরিমাণ কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পরে নিরুপায় হয়ে অন্দর মহল হতে মৌলবী হাফেয কিফায়েতুল্লাহ সাহেবকে বলে পাঠানো হল, কোন বাহানায়

তিলাওয়াতের পরিমাণ আজ কম করে দিও। সে মতে কিছুক্ষণ পড়ার পর মৌলবী সাহেব বুঝতে পারলেন, কে যেন আস্তে আস্তে তার পা টিপে দিচ্ছে। তখন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন যে, তিনি অন্য কেউ নন, স্বয়ং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.। তখন তার বিস্ময় ও লজ্জার কোন অন্ত থাকল না। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত বললেন, না ভাই এতে সমস্যার কি ছিল ? তোমার শরীরটা ক্লান্ত এতে একটু আরাম হত। (সাওয়ানেহে শায়খুল হিন্দ)

মাল্টা হতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরতের আখেরী রমযানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য এক স্থানে সায়্যিদ আসগর সাহেব লেখেন- রমযানের বরকতময় রজনিগুলোতে তারাবীর পর তিনি দারুল উলূম তশরীফ নিয়ে যেতেন। ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকত। রাত্রের অর্ধেক পার হয়ে যেত। উপস্থিত সকলে হযরতের অমীয় ফয়েয দ্বারা ধন্য হতে থাকত। আহ! কে জানত যে, এটিই হযরতের শেষ রমযান।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানবী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মা'মূলাত

"ফাযায়েলে রমযান" সংকলনের সময় দোস্তদের থেকে হযরতের মাহে মুবারকের মা'মূলাত জানার চেষ্টা করেছিলাম। নিজের দূর্ভাগ্য ও হতভাগ্যতার দরুণ মাহে মুবারকে হযরত হাকীমূল উম্মত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর খেদমতে হাজির হওয়ার সুযোগ অধমের কখনো হয় নি। এজন্য হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর জীবদ্দশায়ই মুহতারাম খাজা আজীজুল হাসান সাহেবের খেদমতে এক খানা চিঠি লিখেছিলাম। আপ্‌বীতী পঞ্চম খন্ডে তা প্রকাশিত হয়েছে। হযরত সাহারানপুরী কুদ্দিসা সিররুহুর মাহে মুবারকের মা'মূলাত বর্ণনা করতে গিয়ে এ পুস্তকেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকটি লেখার সময়ও হযরতের বিভিন্ন খাদেম, যারা হযরতের খেদমতে রমযানের পুরো মাস বা কিছু অংশ কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন, তাদের থেকে হযরতের মা'মূলাত জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে খুব সফলতা লাভে সক্ষম হয় নি তবে মা'মূলাতে আশরাফিয়া"য় লেখা আছে যে, মাহে মুবারকে তারাবীতে অধিকাংশ সময় হযরত নিজেই কুরআনে পাক শোনাতেন। বিশেষ কোন সমস্যা না থাকলে তিনি এটা বাদ দিতেন না। ১২ই রমযান পর্যন্ত সোয়া পারা করে এবং পরে প্রতিদিন এক পারা করে অধিকাংশ সময় ২৭মে রমযানে

খতম করতেন। হযরত মুহতারামের পড়ায় কী যে মাধুর্য ছিল তা নিজ কানে যারা শুনেনি তাদেরকে বলে বুঝানো যাবেনা। অন্যান্য ওয়াক্তীয়া নামাযে যেভাবে ধীরে ধীরে পড়তেন তারাবীতেও সেই ঢংয়ে পড়তেন। প্রয়োজনের তাগিদে কখনো দ্রুত পড়লেও শব্দের উচ্চারণ আস্তে আস্তে পড়ার ন্যায় যথাযথ বহাল থাকত। হযরতের তিলাওয়াতে ওয়াকফ ও লাহ্‌জার প্রতি এত খেয়াল করা হত যে, অন্যদের তিলাওয়াতে তার নজীর খুঁজে পাওয়া ভার। স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে, মুশাব্বাহ খুব কমই হত। কুরআনে পাকের সাথে তার স্বভাবজাত সম্পর্ক ছিল। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কালামে পাক সব সময় যেন চোখের সামনে খোলা বলে মনে হত। কোন আয়াতের ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হলে সাথে সাথে বলে দিতে পারতেন। কানপুর অবস্থানকালে তারাবীতে লোকজনের এত সমাগম হত যে, বাদ মাগরিব দ্রুত খাওয়া দাওয়া সেরে মসজিদে আসলে জায়গা পেত; অন্যথায় বঞ্চিত থাকত। এত বড় জামাতে সিজদায় তিলাওয়াত করতে গেলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনকি অনেকের নামায নষ্ট হওয়ারও আশংকা থাকে। এজন্য একবছর হযরত এ মাসআলার উপর আমল করলেন যে, সিজদার আয়াত তিলওয়াত করার সাথে সাথে যদি রুকু করা হয় এবং এতে তিলাওয়াতে সিজদার নিয়ত করে নেয়া হয়, তাহলে সিজদা আদায় হয়ে যায়। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এতদসত্ত্বেও নামাযে রাকাত সমূহ ছোট বড় হত না। এক বরাবর হত।

ইফতার সধারণত মাদ্রাসায় মেহমানদের সাথেই করতেন। আযান যথা সময়ে দেয়া হত। ধীরে সুস্থে ইফতার করতেন, হাত ধুতেন, কুলি করতেন। অতঃপর ধীরস্থির ও শান্তভাবে নামযে দাঁড়াতেন। আযান ও জামাতের মাঝে এটুকু ব্যবধান হত যে, একজন মানুষ ধীরে সুস্থে অযু করে তাকবীর উলার সাথে জামাতে শরীক হতে পারে। মহল্লার লোকজন ঘরে ইফতার সেরে সুন্দরভাবে তাকবীরে উলার সাথে জামাতে শরীক হতে পারত।

বাদ-মাগরিব সমস্ত মা'মূলাত থেকে ফারেগ হয়ে খানা খেতেন। ইশার নামাযের ওয়াক্ত হলে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তারাবীহ পড়তেন। চার রাকাত পর পর প্রতি তারবীহায় দোয়া দরূদ পড়তে থাকতেন। অন্যান্য নামাযের ন্যায় ধীরতার সাথে রুকু-সিজদা আদায় করতেন। তাহাজ্জুদেও অধিকাংশ সময় কেরাত আস্তে আস্তে পড়তেন। অবশ্য মাঝে মধ্যে জোরেও পড়তেন। হযরত যখন ইতেকাফ করতেন, তখন তাহাজ্জুদের সময় দু-চারজন তাঁর পিছে এসে দাঁড়িয়ে যেত। হযরত এদেরকে বাঁধা দিতেন না। তবে

তাহাজ্জুদ জামাতের সাথে পড়ার কোন ব্যবস্থা তাঁর এখানে করা হত না। একবার এমনও দেখা গেছে যে, ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়ে যাওয়ায় মাত্র দুই রাকাতে তিলাওয়াতের নির্ধারিত পরিমাণ আদায় করার পর বললেন, তোমরা সাহরী খেয়ে নাও। সাহরী শেষে সময় পেলে আপন আপন তাহাজ্জুদ সেরে নিও। তাহাজ্জুদের পর কিছুক্ষণ আরাম করে ফজর নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। দিন-রাতের মা'মূলাত তাঁর যথারীতি চলতে থাকত। ইতেকাফও করতেন। রমযানের শেষ দশদিন পূর্ণ আবার কখনো তিন দিনের এতেকাফ করতেন। এ সময় যেন নূরের বৃষ্টি ঝরতে থাকত। এতেকাফের মধ্যে লেখা-লেখির কাজও চালু থাকত। "কছদুছ ছাবীল" পুস্ত কটি এতেকাফ রত অবস্থায় মাত্র আট দিনে সম্পূর্ণ করেন। ওইসব দিনগুলোতে কছদুছ ছাবীলের সাথে الفتوح فيما يتعلق بالروح নামক কিতাবটিও রচনা করেন।

একবার রমযানের ২৮ তরিখে এ অধমের হাকীম মুহাম্মাদ মুস্তফার থানা ভবন হাজির হওয়ার সুযোগ হল। ধারণা ছিল এতদিনে হয়তবা কালামে পাক খতম হয়ে গেছে। কারণ অধিকাংশ মসজিদে সাধারণত ২৭শে রমযানে খতম হয়ে যায়। খানকাহ মসজিদের অবস্থা ও জামাতের রূপের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল না। পরিবর্তনের কোন ধারণাও করা যাচ্ছিল না। এদিকে হযরত সূরা "আদ দোহা" দ্বারা শুরু করলেন। এতে কুরআন খতম হয়ে যাওয়ার ধারণা আরো বদ্ধমুল হল। কারণ খতম শেষে সাধারণত সূরা আদ দোহা দ্বারাই তারাবীহ পড়া হয়। কিন্তু সূরা ইকরায় গিয়ে যখন হযরত স্বশব্দে বিসমিল্লাহ পড়লেন, তখন বুঝতে পারলাম, আজই খতমের দিন। শেষে এ ধারণাই সত্যে পরিণত হল। খতম শেষে দোয়া হল। দোয়া অন্যান্য দিনের মতই হল। অন্যান্য দিনের চেয়ে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য এতে ছিল না। অন্যান্য রাতের ন্যায় একটি বাতিই মসজিদে জ্বলছিল। মানুষের সমাগম অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশী ছিল না এবং খতম শেষে কোন প্রকার মিষ্টিও বিতরণ করা হল না। এক ব্যক্তি অনুমতি প্রার্থনা করে আরয করল, কিছু মিষ্টি বিতরণ করতে মন চায়, কিন্তু হযরত তাকে নিষেধ করে দিয়ে বললেন, আজ নয় মন চাইলে কাল বিতরণ করবেন। খেজুর-পানি ইত্যাদিতেও কোন প্রকার দম করা হল না হযরত শেষে সূরা বাকারার প্রথম থেকে নিয়ে "আল মুফলিহুন" পর্যন্ত পড়লেন। (মামূলাতে আশরাফী)

অন্য এক জায়গায় হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর রোজকার মা'মূলাত প্রসঙ্গে লিখেন, অধিকাংশ দিন অর্ধরাত কেটে যাওয়ার পর হযরত তাহাজ্জুদের জন্য উঠেন। আবার কখনো রাত্রের ষষ্ঠাংশে, আবার কখনো কখনো এ থেকে কমবেশিও হত। মাহে মুবারকে তাহাজ্জুদে এক পারা করে পড়তেন। মাঝে মধ্যে এ থেকে বেশীও হত। তাহাজ্জুদ নামাযে যখন দাঁড়াতেন তখন মনে হত সুবহে সাদিকের ন্যায় একটি বিমল আলোক রেখা যেন ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে এবং সফেদ নূরের স্ফুলিংঙ্গ যেন হযরতের শরীর থেকে বের হয়ে উর্ধ্বগতির দিকে ছুটে যাচ্ছে। (মামূলাতে আশরাফী)

হুছনুল আজীজ নামক পুস্তকের প্রথম খন্ডে-১৩৩৪ হিজরীর রমযানের মালফুযাত বর্ণনার শুরুতে হযরত হাকীমুল উম্মত নিজের একটি লেখার পূর্বে স্বীয় রাজনীতির ধারাকে ওয়াজের লাইনে পরিবর্তন করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হাজারো খায়ের বরকত নিয়ে মাহে মুবারক হাজির হয়েছে। এ মাসে যেহেতু সাধারণত সব ধরণের জাগতিক সম্পর্ক হ্রাস পেয়ে যায়। বিশেষ করে এ বছর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় পুরোমাসের জুমার ওয়াজও অন্যের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছি, তারাবীতে কুরআন খতম করার জন্যও অন্য লোক ঠিক করা হয়েছে। পূর্বের ন্যায় নুতন কোন ছবকও শুরু করা হয় নি। আগের বৎসরের ন্যায় এ বছরও যিকির আযকার ও তা'লীম বন্ধ রয়ে গেল। ফলে এ বৎসরের রমযান অনেক বেশি বাইরের সম্পর্কহীনতার মধ্যে কাটানোর সুযোগ হল। তাই প্রস্তাবিত ঐ বিষয়টি উদ্বোধনের জন্য এ মাসটি খুব উপযোগী মনে হল। তাই আল্লাহর নামে পূর্বের রাজনীতি ধারাকে ওয়াজের ধারায় পরিবর্তন করতে চাচ্ছি এবং এর জন্য আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা করছি।

একটি মালফুযাতে হযরত ইরশাদ করেন- ইফতারের সময় কিছুটা কম খেলে সাহরী রুচিমত খাওয়া যায়। আরো বলেন, তারাবীর পর আম বা এ জাতীয় বাড়তি জিনিস খেয়ে থাকি। এতে করে নামাযে কষ্ট হয় না। এমনিতে রমযান মাসে কিছু বাড়তি খানা-খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে যায়। যেমন কেউ আম কেউ ফুলরী বা অন্য কোন হাদিয়া পাঠিয়ে দেয়। বাড়ীতে কিছুনা কিছু নতুন জিনিস পাকানো হয়। আর এটা হওয়াই সাভাবিক, কারণ হাদীস শরীফে এসেছে এটা এমন এক মাস যাতে মুমিনদের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আরো সামনে গিয়ে বলেন- রমযানে আমার দ্বারা বাড়তি কোন ইবাদত হয় না। সময়ের মধ্যে গড়বড় হয়ে যায়। রোজা ও তারাবীর

মুকাবিলায় সমস্ত ইবাদত ম্লান হয়ে যায়, যেমন সূর্যের মুকাবিলায় সমস্ত তারকারাজি ম্লান হয়ে যায়। মূলতঃ নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যই এমন ব্যাখা করে থাকি।

তারাবীতে ক্বারী সাহেবের তিলাওয়াত শুনে অন্দর মহলে মহিলাদেরকে নিয়ে চার রাকাত নামায পড়তেন। এই চার রাকাতে তিনি নিজের তিলাওয়াত শোনাতেন। ফলে বারটার আগে আরাম করা সম্ভব হত না। আড়াইটার দিকে সাহরীর জন্য উঠে যেতেন। এরপর সকাল পর্যন্ত আর শোয়া হত না। এমনিতে শোয়ার পরও অনেক দেরীতে হযরতের ঘুম আসত। আবার অনেক সময় ঘুম আসতই না। ঘুম কম হওয়ার কষ্ট হযরতের বরাবরই ছিল। আজকাল নামকা ওয়াস্তে দু'ঘন্টা হযরতকে শুতে দেখা যায়। অতঃপর তিনি বলেন, খামোখা শোয়ার ভান করি, একটু হিম্মত করলেই সারা রাত অনিদ্রায় কাটানো যায়। বসে বসে ঘন্টা দুই কিছু পড়তে থাকি। সম্ভবত সারা রাত অনিদ্রায় কাটানোর তাওফীক এজন্য হয় না যে, এতে করে নফস অহংকার করার সুযোগ পাবে যে, আমি সারারাত ইবাদতে কাটিয়েছি। (হুছনুল আজীজ)

জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, রমযানে ইবাদতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া ইবাদতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার পরিপন্থী নয় কি? জবাবে হযরত বললেন - রমযানে যদি কেহ তার মা'মূলাত বাড়িয়ে নেয় তাহলে এটা ইবাদতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার পরিপন্থী হবে না। কারণ, রমযানে যখন মা'মূলাত বাড়িয়ে নেওয়া হয় তখন এ নিয়ত করা হয় না যে, রমযানের পরও একে বহাল রাখা হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, রমযানে নবী করীম সা.এর আমল ও ইবাদত বেড়ে যেত। (আনফাসে ঈসা)

হাকীম মুহাম্মাদ ইউসূফ সাহেব বিজনূরী এক জায়গায় লিখেন, এ বছর অর্থাৎ ১৩৩৭ হিজরীর রমযানে থানা ভবন অবস্থান করার সুযোগ অধমের হয়। রমযানের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অধম তারাবীতে শরীক ছিল। হযরত ওয়ালা তারাবীতে কুরআনে পাক শোনাতেন। যেহেতু হযরত ওয়ালা প্রত্যেক কাজে সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। তাই আমার মন চাচ্ছে হযরতের এখানের তারাবীর পূর্ণ নকশা তুলে ধরি। যাতে করে অন্যদের জন্য তার অনুসরণ করা সহজ হয়।

রমযানে হযরতের এখানে ইশার আযান সূর্যাস্তের এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পর দেয়া হত। তার পৌনে এক ঘন্টার পর জামাতে দাঁড়াত। ফরয

নামাযের কেরাত দীর্ঘ করা হত না। সাধারণত "আলামতারা ও অন্তীনি" জাতীয় সুরা দ্বারা ফরয পড়া হত। ফরযের তুলনায় তারাবীর কেরাতের গতি কিছুটা দ্রুত হত। তবে প্রত্যেকটি হরফ আলাদা আলাদাভাবে বুঝা যেত। ইজহার ইখফা ইত্যাদি তাজবীদের কায়দার প্রতিও খেয়াল রাখা হত। শুরুতে হযরত সোয়া পারা করে পড়তেন। পরে কম করে দিলেন। ২৭শে রমযানে খতম শেষ করলেন। ফরয ও তারাবীহ বিতরসহ সর্বমোট দেড় ঘন্টা সময় ব্যয় হত, কোন কোনদিন এর চেয়েও কম সময় ব্যয় হত। চার রাকাত পর আরামের সময়ে পঁচিশবার করে দুরূদ শরীফ পড়তেন। এতে অল্প অল্প শব্দ হত। এ বিষয়ে আমি হযরতকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কুরআন হাদীসে এ সময় নির্দিষ্ট কোন যিকিরের উল্লেখ নেই। তখন আমি দরুদ শরীফ পড়তে থাকি। কারণ, এটাই আমার কাছে ভাল মনে হয়। পঁচিশবার পড়ার কারণ হচ্ছে, যাতে করে এ সময়ের মধ্যে মুসল্লিরা পানি পানসহ অন্যান্য জরুরত থেকে ফারিগ হয়ে যেতে পারে তারাবীর পর দোয়া করা হত। অতঃপর বিতর পড়া হত। সিজদায় তিলাওয়াতের সময় কখনো রুকুর সাথে তার নিয়ত করে নিতেন। সূরা ইকরার শুরুতে স্বশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন। قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা একবারই পাঠ করলেন। এ বিষয়ে তাঁকে

প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা তিনবার পড়ার যে প্রথা রয়েছে অনেক ওলামায় কেরাম তাকে মাকরূহ বলেছেন। অবশ্য কেউ কেউ জায়েযও বলেছেন। তবে একে মুস্তাহাব মনে করা ভুল। তারাবীতে বার বার পড়া শুধু একটি রুসম মাত্র।

এ বিষয়ে হযরতের একটি দীর্ঘ মালফূয রয়েছে। সেখানে হযরত ইরশাদ করেন, হাদীসেপাকে সূরায় ইখলাসকে কালামেপাকের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। একথা বলা হয়নি যে, তা তিনবার পড়লে কুরআন খতমের সাওয়াব পাওয়া যাবে। শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব (রাহ.) এ বিষয়ে বিস্ময়কর এক জবাব দিয়েছেন, তিনি বলেন, হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকু বুঝা যায় যে সূরায় ইখলাস একবার পাঠ করলে এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সাওয়াব পাওয়া যাবে। অতএব তিনবার পাঠ করলে তিন তৃতীয়াংশের সাওয়াব হবে। তবে তিন তৃতীয়াংশ দ্বারা পুরা কুরআনের সাওয়াব প্রমাণিত হয় না। এতে কি পুরো কুরআন পড়া হয়? (হুসনুল আজীজ)

খতমের দিনেও তারাবীহ শেষে অন্যান্য দিনের ন্যায় অন্দর মহলে চলে গেলেন। না অতিরিক্ত বাতি জালানো হল না কোন মিষ্টি বিতরণ করা হল। খতমের পর তিনদিনের প্রথম দিনের তারাবীতে "অদ্দোহা" থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়লেন, দ্বিতীয় দিনের তারাবীতে "আলামতারা" থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এবং তৃতীয় দিনে "আম্মাইয়াতাসা আলুন" থেকে নিয়ে অর্ধ পারা পর্যন্ত পড়লেন। (হুসনুল আজীজ)

আল্লাহ পাকের শুকর, হযরত হাকীমুল উম্মতের বেশ কিছু মা'মুল লাভ করা গেল। তাই যাবতীয় প্রশংসা মহান প্রভুর জন্য। এখানে একটি আমাদের কাহিনীও উল্লেখ করতে চাচ্ছি। আপ্‌বীতীর অনেক জায়গাতেই তা উল্লেখ করেছে। আমার আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর সাথে হযরত হাকীমুল উম্মত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর সমবয়সী হওয়া জনিত বড় খোলামেলা এবং রসাল সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কীয় অনেক কাহিনী মাঝে মধ্যে মনে পড়ে যায়। একবার মাহে মুবারকে আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু হযরত হাকীমুল উম্মত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মেহমান হলেন। আব্বাজান হযরত হাকীমুল উম্মতকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এখানে ইফতারের নিয়ম কি? হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহু বললেন, ইফতারের সময় হয়ে যাওয়ার পর মনের সন্দেহ দূর করার জন্য আরো তিন চার মিনিট অপেক্ষা করতে থাকি। ঐদিন আব্বাজানের উপস্থিতির দরুণ ইফতারীতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

ইফতারের সময় আব্বাজান ক্যালেন্ডারের সময় অনুপাতে ঘড়ির দিকে তাকালেন, অতঃপর আসমানের দিকে দেখে এই বলে ইফতার শুরু করে দিলেন যে, আপনি মনের সন্দেহ দূর করতে থাকুন। আব্বাজানের সঙ্গীভক্ত যারা ছিলেন তারাও তাকে দেখে ইফতার শুরু করে দিলেন। হযরত হাকীমুল উম্মত ও তাঁর সঙ্গীরা অপেক্ষা করতে থাকলেন। মিনিট দুয়েক পর হযরত থানবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু বলে উঠলেন, আমার মনের সন্দেহ দূর হওয়া পর্যন্ত মনে হচ্ছে দস্তরখানে আর কিছুই বাকী থাকবে না।

তারাবীর পর হযরত থানবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুকে জিজ্ঞেস করলেন, মাওলানা! সাহরীতে আপনার নিয়ম কি? আব্বাজান বললেন, সাহরী এমন সময় খাই যে, রোযা হল কি হল না সারাদিন এই সন্দেহে থাকি। আব্বাজান একটু বাড়িয়ে বলেছিলেন। অন্যথায় ছুবহে ছাদিকের দুই তিন মিনিট পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ

করতেন। হযরত থানবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু বললেন, কিন্তু আমি ছুবহে ছাদিকের এক ঘন্টা পূর্বে সাহরী থেকে ফারিগ হয়ে যাই। আব্বাজান বললেন, আপনি আপনার সময়মত খেয়ে নিবেন আমি আমার সময় মত খেয়ে নিব। দেড় দিন রোজা রাখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। হযরত থানবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু বললেন তা হয় না, এক সাথেই খাব। তবে এক দিনের তরে আপনাকে আমার জন্য একটু কষ্ট করতে হবে। আরেকদিন না হয় আমি আপনার জন্য কষ্ট করে নিব। শেষে সিদ্ধান্ত হল, পৌনে এক ঘন্টা পূর্বে সাহরী খাওয়া শুরু করা হবে। পনের বিশ মিনিট খানা-পিনায় ব্যয় হবে এবং আধা ঘন্টা পূর্বে খানা-পিনা থেকে ফারিগ হওয়া যাবে। (আপ্‌বীতী চতুর্থ খণ্ড)

এ পর্যন্ত লেখার পর মাদরাসায় মাজাহিরে উলুম সাহারানপুরের শিক্ষা সচিব মাওলানা আলহাজ্ব আসাদুল্লাহ সহেব আমার কাছে এ মর্মে একটি চিরকুট লিখে পাঠালেন যে, আপনি খাজা আজীজুল হাসান সাহেবের নামে যেসব প্রশ্ন করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার যেগুলোর জবাব আমার জানা ছিল তা পেশ করছি।

(ছয়) হযরত থানবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু উপস্থিত সকলের সাথে মিলে ইফতার করতেন।

(আট) মাগরিবের পরের নফল নামায অন্যান্য মাসের তুলনায় সংখ্যায় বেশী বা রাকাত লম্বা হত বলে মনে পড়েনা।

(নয়) ছয় রাকাত আওয়াবীন আদায় করতেন। কখনো কখনো তা বসে বসেও পড়তেন।

বসে পড়া সম্পর্কে একবার হযরতকে প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, মাঝে মধ্যে বসে এজন্য পড়ি যেন অহংকার সৃষ্টি না হতে পারে। নামায পড়াবস্থায় তিনি কাউকে বাতাস করতে দিতেন না এ সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করলে হযরত বললেন, ইবাদতের সময় কারো খিদমত নিতে মন চায়না।

(আঠার) রমযান ও অন্যান্য মাসে ফজরের নামায একই সময়ে পড়া হত। অর্থাৎ আকাশ ফর্সা হলে পড়া হত।

(একুশ) আমার জানা মতে হযরত কারো সাথে দাওয়া করতেন না।

(বাইশ) আমার যতটুকু মনে পড়ে, অধিকাংশ সময় হযরত দেখে দেখেই কালামে পাক তিলাওয়াত করতেন। হযরতের কালামে পাক খুব ভাল ইয়াদ ছিল দুই ব্যক্তিই এমন পেয়েছি যাদের ন্যায় অন্য কারো কালামে পাক ইয়াদ ছিল না। একজন হলে হযরত থানবী রহ. অন্যজন কারী আব্দুল খালেক সাহেব। সমাপ্ত

একবার হযরত থানবী রহ. বললেন আমার রমযানের মা'মূলাত অন্যান্য মাসের মতই থাকে। অনেক বুযুর্গের দরবারে ইফতারীতে অনেক মা'মূলাত হয়ে থাকে। খেজুর বা যমযম দ্বারা ইফতার করার ব্যাপারে তারা খুব যত্নবান থাকেন। আমার সাধারণ অভ্যাস এই যে, ইফতারের সময় আমার সামনে যা আসে চাই তা খেজুর হোক বা যমযম এবং গরম পানি হোক বা পেয়ারা তা দিয়েই ইফতার সেরে ফেলি। (ইফাযাতে ইয়াওমিয়া)

এ পর্যন্ত লেখার পর থানা ভবনে অবস্থানরত মাওলানা আলহাজ যহুরুল হাসান সাহেবের পরপর দুটি চিঠি আমার নামে আসে। অন্যান্যদের মতো তার কাছেও আমি হযরত থানবীর মা'মূলাত বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। জনাব তাঁর চিঠির সাথে এ পয়গামও পাঠিয়েছিলেন যে, আকাবিরদের মামূলাতের সাথে এগুলোকেও যেন প্রকাশ করা হয়।

তিনি প্রথম চিঠি লিখেছিলেন, ১৬ই জুমাদাছ ছানীতে। মাজাহিরে উলূমে শিক্ষারত তার পুত্র মৌলবী নাজমুল হাসানের মারফত আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম বিধায় তিনিও তার মারফত আমার নামে জবাব পাঠালেন। তিনি লিখেন স্নেহের নাজমুল হাসান! আল্লাহপাক তোমাকে হিফাযত করুক। আছ্ছালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লহ। তোমার মারফত হযরত শায়খুল হাদীস মাদ্দা যিল্লুহুর চিঠি হস্তগত হল। তোমার জানা আছে যে, আমি সাহারানপুর দিনের দশ এগারটার দিকে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য এসে থাকি। ফলে হযরত শায়খের সাক্ষাত থেকে আমাকে মাহরুম হয়ে ফিরে আসতে হয়। কারণ ঐটা হযরতের সাথে সাক্ষাতের সময় নয়। যাহোক চেষ্টা করব যে, হযরতের দরবারে কোন এক রাত অবস্থান করা যায় কিনা। আমার স্মরণ শক্তি খুব দুর্বল, তাই হযরত থানবী রহ.র কথাগুলো হুবহু বর্ণনা করাতো সম্ভব নয় তবে হযরতের মোটামুটি বক্তব্য পেশ করছি। চিঠি লেখার এ ঘটনা ১৩৪৯ হিজরীর রমযান মাসে ঘটেছিলো। এ বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. বিভিন্ন সময়ে। বিভিন্ন ঢংয়ে মালফুয পেশ করতেন, যা তার মালফুযাত পড়া বা শোনার সময়

মনে পড়ে যায়। এখন আমার যতটুকু মনে আছে তা হচ্ছে। তিনি বলতেন, শরীয়তের পক্ষ থেকে শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামদের মা'মূলাতকেই পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন উম্মতের মা'মূলাত পালন করার নির্দেশ শরীয়তের পক্ষ থেকে দেয়া হয় নি। তদুপরি উম্মতের মা'মূলাত জমা করার মধ্যে কিছু ক্ষতির দিকও রয়ে গেছে। তাই এর পিছে পড়া ঠিক নয় একটি ক্ষতি হল, এগুলো যারা পড়বে তাদের আমলের অবস্থা দু'য়ের যে কোন একটি হবে। হয় তাদের আমল বেশী হবে বা কম। বেশী হবে এতে তার হিম্মত নষ্ট হয়ে যাবে। সে ভাববে এত বড় বুযুর্গের আমল যখন এত কম, তখন আমাদের মতো ছোটদের এ কষ্ট করে কি লাভ? আর বুযুর্গের আমল বেশী ও নিজের আমল কম হলে নিজের দুর্বলতার কথা মনে করে আমল ত্যাগ করে বসবে। ভাববে, আমাদের মতো লোকের দ্বারা কি এত আমল সম্ভব?

একবার ইরশাদ করলেন, আমার মা'মুলাতইবা আর কি আছে যা বয়ান করা যায়? রমযান ও অন্যান্য মাসে আমার মা'মূলাতের অবস্থা একই থাকে। আমার সারাটি সময় বিভিন্ন কাজে ঘেরা, তাই রমযানে নতুন কোন সময় হয়ে উঠে না যাতে নতুন কোন আমল যোগ করা হবে। রমযানে বা রমযানের বাইরে যে কোন মাসই হোকনা কেন ঐ সব কাজের মধ্যে ব্যতিব্যস্থ থাকতে হয়। সামনেও নতুন কোন কথা মনে পড়লে বা নতুন কোন মালফূয পড়ার মধ্যে আসলে হযরতকে জানাব। অছ্ছালাম

পরে মাওলানা যহুরুল হাসান সাহেবের দ্বিতীয় আরেকটি চিঠি ১৮ই জুমাদাছ ছানী পূর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট শিরোনামে হস্তগত হয়। এতে তিনি লিখেন, বিভিন্ন বুযুর্গের মা'মূলাত সংকলনের ক্ষতি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত থানবী রহ. বলেছিলেন, সাধারণ লোকজনের অন্তদৃষ্টির অভাব থাকে। ফলে তারা একে মাপকাঠি বানিয়ে যার মধ্যে তাহাজ্জুদ বা যিকির তিলাওয়াত বেশী দেখতে পাবে তাকে সবচেয়ে বড় বুজুর্গ মনে করে বসবে এবং যার মধ্যে কম দেখতে পাবে তাকে ছোট বলে মনে করতে থাকবে। যার ফলে নিজের ভক্তিভাজনকে বড় করে দেখবে ও অন্যদেগরকে হীন মনে করার ব্যাধিতে লিপ্ত হয়ে যাবে। সে নিজের অপরিপক্ক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনগড়া মাপকাঠি দ্বারা বড়কে ছোট বা ছোটকে বড় বলে ভুল সিদ্ধান্ত করে বসবে এবং পরিণামে নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে ছাড়বে।

একদিন বললেন, বাদ-ফজর মুছল্লায় বসে থেকে যিকির তিলাওয়াতে মগ্ন থাকা অতঃপর একেবারে ইশরাক পড়ে উঠলে হাদীসের বর্ণনা অনুসারে একটি হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব পাওয়া যায়। তবে ঐ সময় অন্য কোন আমল এর চেয়েও বেশী দামি হওয়া অসম্ভব নয়। আমার ধারণামতে আল্লাহপাকের বাণী দুশমনের বিরুদ্ধে সামর্থ অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করতে থাক, এ আয়াতের ওপর আমল করার নিয়তে বাদ-ফজর মুসাল্লায় বসে না থেকে হাটাহাটি করা ও তিলাওয়াত করা বেশী উত্তম। হযরতের নিজের মা'মূলাতও এমন ছিল যে, বাদ-ফজর তিনি প্রায় দু'মাইল হাটাহাটি করতেন এবং এর মধ্যে কালামে পাকের এক মনজিল এবং মুনাজাতে মাকবুলের এক মনজিল পড়ে ফেলতেন। পরে ইশরাকের নামায পড়তেন। হযরতের তিলাওয়াত গভীর ধ্যানের সাথে হত। ফলে এই তিলাওয়াতের মধ্য দিয়েই অনেক মাসলা- মাসাঈল ও তাসাউফ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সমাধান লাভ করতে থাকতেন।

ভুলে যাবেন ভেবে সাথে সাথে সেগুলো কাগজ কলম দ্বারা নোটও করে নিতেন। পরে হুজরায় ফিরে সেগুলোকে যথাস্থানে বসাতেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো এটিকে শুধু হাটা-হাটিই মনে হত, অজীফা আদায় করা মনে করা হত না। তবে মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অজীফা আদায় করা থেকে শতগুনে উওম ইলমী ও ইসলাহী খিদমত ছিল। খানকা থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে যেসব বাচ্চারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসত, তাদের সাথে আমোদ করতেন তাদের মেধা অনুপাতে কথাবার্তা বলতেন এবং তাদের কথাবার্তা থোকে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো কুড়িয়ে নিতেন। অন্দর মহলে গিয়ে ঘরওয়ালাদের হক আদায় করার নিয়তে খোশগল্প করতেন। মেহমান মহিলাদের প্রয়োজনীয় কথাবার্থা শুনতেন। তাদের জন্য আমলী কথাবার্তাও বলতেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলোকে দুনিয়ার কাজ মনে হলেও মূলতঃ তার প্রতিটি মুহুর্তই যেন এক একটি ইসলাহী দরস ও আমলী দা'ওয়াত ছিল। এজন্য অজীফা ও যিকির-আযকার থেকেও এগুলোর গুরুত্ব বেশী। সাধারণ মানুষ যদি এই গভীরতায় না পৌছতে পারে এবং হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায় তবে এটি হবে তাদের জ্ঞানের দুর্বলতা।

যে সমস্ত উপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য করে আপনি আকাবিরদের মা'মূলাত সংকলন করতে চাচ্ছেন, সেগুলোর পাশাপাশি হযরত থানবী রহ.এর উক্ত বাণীগুলোও যদি উল্লেখ করে দেন তাহলে সাধারণ লোকদের

তরফ থেকে যেসব ক্ষতির আশংকা ছিল তা আর থাকবেনা এবং এর বিপরীত দিকটিও সকলের সামনে এসে যাবে। অথবা হযরত যেটা ভাল মনে করেন। শুধু হুকুম পালনার্থে কথাগুলো লিখলাম, অস্‌সালাম।

বান্দা যহুরুল হাসান উফিয়া আনহু
১৮ই জুমাদাস্ সানী

মাহে মুবারকে হযরত হাকীমুল উম্মত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মা'মূলাত তো অধম মা'মূলাতে আশরাফিয়া ও হুছনুল আজীজ ইত্যাদি কিতাবের বরাত দিয়ে ওপরে উল্লেখ করেছি। তবে মাওলানা যহুরুল হাসান সাহেব হযরতের যে ইলমী ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করেছেন তার গুরুত্বও অনেক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইলমী ব্যতিব্যস্ততা যিকির আযকার থেকেও বেশী গুরুত্ব রাখে। ওপরে মুর্শিদী হযরত সাহারানপুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মা'মূলাত বর্ণনায় উল্লেখ করেছি বাযলুল মাজহুদ সংকলন কালে মাহে রমযানেও তিনি ইশরাকের পর হতে দুপুর পর্যন্ত তা লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন কি এতেকাফের দিনগুলোতেও মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সহযোগী কিতাবাদী পৌছে দেয়া হত। আকাবিরদের মা'মূলাত সংকলনের উদ্দেশ্য হল, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার রুচি ও অবস্থাভেদে মাশায়েখদের মধ্যে হতে যার মা'মূলাতের ওপর চলাকে নিজের রুচি ও অবস্থার অনুকুলে মনে করবে সে অনুপাতে সে চলার হিম্মত করবে। ফুল বাগানের শোভা তখনই পরিপূর্ণ হয়, তথায় যদি থাকে সবজাতীয় ফুলের সমাহার, একজাতীয় ফুলদ্বারা বাগানের শোভা কখনো চুড়ান্তে পৌছেনা।

ফাযায়েলে রমযান নামক কিতাবের শুরুতে লিখে এসেছি যে, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর এখানে রমযান ও অন্যান্য মাসের মা'মূলাতের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। প্রকাশ থাকে যে, ফাযায়েলে রমযান' কিতাবখানা ১৩৪৯ হিজরীতে রমযান মাসে এতেকাফ অবস্থায়ই লেখা হয়েছিলো সেথায় একথাও লেখা হয়েছে যে, আকাবির ও বুযুর্গদের মা'মূলাত শুধু এজন্য লেখা হয় না যে, ভাষা ভাষা নজরে তা পড়ে নেয়া হবে বা তাদের শানে কোন প্রশংসামুলক বাক্য ব্যবহার করে ক্ষান্ত করা হবে, বরং সাধ্যানুযায়ী এগুলোর অনুসরণ করা হবে, এই মহান লক্ষ্যেই কেবল তা

নকল করা হয়। কারণ, প্রত্যেকটি বিষয় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দরুণ অন্যের ওপর প্রাধান্য পায়।

আকাবির বুযুর্গদের প্রতি অধমের শুধু অন্ধ ভক্তি নয়, বরং বাস্তবেই তাঁরা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তব গুণাগুণের নমুনা এবং কবির আগত উক্তির যথার্থ উপমা। কবি বলেন, সবার মধ্যে যত গুণ আছে তোমার একার মধ্যে তার সবটাই আছে। তারা ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু ইলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন গুণাগুণের প্রতিচ্ছায়া। অধম খিওয়ানে খলীল নামক কিতাবে হযরত হাকীমুল উম্মত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে, আকাবিরদের সম্পর্কে লিখেছি যে, এরাই তারা, ইবাদতের চেয়ে যাদের ঘুমের দাম বেশী। এদেরই খোদাভীতির ওপর ফখর করে থাকে মুসলমানী। নবুওতী অরাছাতের সৌরভীত হয় তাঁদের শান। তাঁদেরই কাজ হচ্ছে ধর্মীয় ময়দানের পাহারাদারী। তাঁরা পৃথিবীতেই থাকেন। কিন্তু এর সাথে তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকে না। তারা নদীতে চলেন, কিন্তু কাপড়ে কখনো পানি লাগেনা, নির্জনে বসেও তাঁরা সমাবেশের মজা পান। আর সমাবেশে আসলে চুপ হয়ে যায় তাঁদের মুখের বাণী। সেখানে আকাবিরদের সম্পর্কে একথাও লিখেছিলাম।

اُولٰئِكَ اٰبائي فجئني بمثلهم - اذا جمعتنا يا جرير لمجامع

এরা হচ্ছেন আমার পূর্ব পুরুষগণ। সুতরাং হে জারীর! যখন ফখরের মজলিসে আমরা একত্রিত হব, তখন পারলে এদের দৃষ্টান্ত পেশ করিও। অন্য কবি বলেন,

ইলাহী! কি মহৎ মহৎ ছুরত তুমি সৃষ্টি করেছ
যারা দস্তবুচি নয়, বরং কদমবুচির যোগ্য

এই দ্বিতীয় লাইনটিকে আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষাসচিব জনাব মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহেব সংশোধন করেছিলেন, সেটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তথাপি বিভিন্ন জাতীয় ফুলে ভরা বাগানের ন্যায় আমার আকাবির বুযুর্গদের দৃষ্টান্ত। তাঁদের প্রত্যেকের রুপরস আলাদা, মাধুর্য

আলাদা, সুগন্ধি আলাদা। ফুল বাগানে যখন বিভিন্ন জাতের ফুলের সমাবেশ ঘটে কেবল তখনই তা সৌন্দর্যের চুড়ান্তে পৌছে। কবি বলেন, বিভিন্ন রঙ্গে ফল দ্বারাই বাগানের শোভা বাড়ে। হে যওক! বিভিন্নতার মধ্যেই পৃথিবীর শোভা নিহীত।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা আলহাজ্ব হুসাইন আহমদ মাদানী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু

মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেব আজমী ভিন্ন একটি পুস্তিকায় ১৩৬৫ হিজরীতে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর সিলেটে অবস্থান কালীন রমযানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। সংক্ষেপে তা এখানে উল্লেখ করছি যদিও সংক্ষেপটিও অনেক বিস্তারিত। তবে আকাবির ও পূর্বসূরী বুযুর্গদের কারো রমযান সম্পর্কে এত বিস্তারিত বিবরণ কোন পুস্তিকায় আমি পাইনি। তাই মন চাচ্ছে যে, কমপক্ষে হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর রমযানের বিস্তারিত বর্ণনা সকলের সামনে এসে যাক। তিনি বলেন,

সিলেটে হযরত মাওলানা রহ. দারোগা আব্দুস সাত্তার মরহুমের বাড়ীতে অবস্থান করতেন। সেখান থেকে প্রায় দু'ফার্লং দূরে অবস্থিত নয়া সড়কের বড় মসজিদে হযরত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে যে সমস্ত ভক্তগণ সাক্ষাত ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতেন রমযান মাসে তারা এ মসজিদেই অবস্থান করতেন। পুরোমাস হযরত এখানে অবস্থান করতেন বিধায় তিনি মুকীম হওয়ার নিয়ত করতেন এবং প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাযের ইমামতী তিনি করতেন। হযরতের মুসাল্লার চারিপাশ দিয়ে পানিতে দম করার জন্য অসংখ্য বোতল রাখা থাকত। বাদ জোহর সেগুলোতে ফুঁক দিয়ে দিতেন। অতঃপর জোহর পর্যন্ত যত দরখাস্ত এসে জমা হত সেগুলোকে জায়নামাযের নীচ থেকে বের করতেন। প্রত্যেকটি পড়তেন এবং আবেদনকারীকে ডেকে তার আবেদন পূর্ণ করতেন। তাবীজও লিখে দিতেন। বাইয়াতের দরখাস্তগুলো আলাদা এক জায়গায় জমা করতেন। অন্যান্য দরখাস্ত থেকে ফারিগ হয়ে বাইয়াত প্রার্থীদেরকে বাইয়াত করাতেন। এরপর আরো কিছুক্ষণ ওয়াজ- নসিহত করার পর দৌলতখানায় চলে যেতেন। ঘরে পৌছে হয় সাথে সাথে একটু শুয়ে যেতেন, না হয় তিলাওয়াতে লিপ্ত হতেন। চিঠিপত্রের উত্তর প্রদানের কাজ বাকী থাকলে তাও করতেন। এর মধ্য দিয়ে বিশেষ সাক্ষাতের সিলসিলাও জারি থাকত।

আছরের আযান হলে জরুরত সেরে মসজিদে চলে যেতেন। বাদ আছর দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল সাহেবের সাথে সোয়া পারা কালামে পাকের দাওর করতেন। দাওর

এভাবে করতেন যে, প্রথমে হযরত পোয়া পারা তিলাওয়াত করতেন, পরে মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব ঐ পারাই পড়তেন। সূর্যাস্তের পূর্বে দাওর শেষ হয়ে গেলে হযরত মুরাকাবা ও ধ্যানের সাগরে ডুবে যেতেন। অন্যান্য ভক্তরা তখন যিকির আযকার করতে থাকতেন। ইফতারের সময় দস্তরখানে সাধারণত খেজুর, যমযম, নাশপাতি, আনারস, সাগরকলা, পেয়ারা, আম, বম্বী খেজুর, ডাব, পেঁপে জর্দা ও সিদ্ধ ডিম থাকত। হিন্দুস্তানের সাধারণ ইফতারী অর্থাৎ চনাবুট, ফুলরী ইত্যাদি দস্তরখানে দেখা যেত না। আমি মনে করতাম এখানে হয়ত এগুলোর প্রচলন নেই। পরে জানতে পারলাম, প্রচলন তো খুব আছে, তবে এখানে এগুলোকে নীচু মানের মনে করা হয়, ফলে সেগুলোকে হযরতের দস্তরখানে হাজির করাকে অপমান মনে করা হত। এত কিছু সত্ত্বেও হযরতের ইফতার হত খুবই সংক্ষিপ্ত। ইফতারের সময় সারা দস্তরখান জুড়ে আনন্দের জোয়ার বইতে থাকত। কিন্তু হযরত কুদ্দিসা সিররুহু ধ্যানের সাগরে ডুবে গিয়ে নিশ্চুপ থাকতেন। হাদীসে পাকে এসেছে রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। তার একটি হল ইফতারের মুহূর্ত। হযরতের দস্তরখান তার আমলী নমুনা ছিল।

ইফতারের জায়গা মসজিদের নিকটেই ছিল। কিন্তু বাদ আছর কালামে পাকের দাওর সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত ধ্যানের রাজ্যে এতো মারাত্মকভাবে হারিয়ে যেতেন যে, অনেকদিন মাগরিবের আযানের কথা পর্যন্ত বলে দেয়া লাগতো। ভক্তদের হাযিরার সময় এ অধমও হযরতের ধ্যানরাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার অবস্থা বার বার নিরীক্ষণ করেছি। অন্যান্যরা রাজনৈতিক আলাপ-সালাপে মত্ত থাকত, আর হযরত কখনো কখনো শুধু হুঁ-হ্যাঁ করতেন। তখন আমি বুঝতে পরতাম যে, হযরতজী আর এ জগতে নেই। বিভিন্ন ধরণের ইফতারির সমাহার থাকা সত্ত্বেও হযরত শুধু খেজুর ও যমযম গ্রহণ করার পর কোন ফলের একটি ফালি খেয়ে ডাবের পানি পান করতেন। পরে এক আধ পেয়ালা চা পান করতেন। তবে সকলের শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত দস্তরখানে বসে থাকতেন। কখনো কখনো আমাদের কোন কথাও বলতে থাকতেন। ইফতারিতে আট-দশ মিনিটের মতো সময় ব্যয় হত।

মাগরিবের নামায খুব সংক্ষেপে পড়তেন। পরে হযরত লম্বা সুরায় নফল পড়তেন,যাতে আধা ঘন্টা লেগে যেত। অতঃপর দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করতে থাকতেন, উপস্থিত সকলে এতে শরীক হতেন। এরপর কোথাও খানার দাওয়াত থাকলে সরাসরি মসজিদ থেকে তার বাড়ীতে

চলে যেতেন। আর দাওয়াত না থাকলে হুজরাখানায় চলে যেতেন। খাওয়ার সময় দু'ধরণের দস্তরখান বিছানো হত। একটি হযরত ও তাঁর সাথীদের মধ্যে যারা রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত তাদের জন্য, আরেকটি অন্যান্য মেহমান যারা ভাত খাওয়ায় অভ্যস্ত তাঁদের জন্য সাহেবজাদা মাওলানা আসাদ সাহেব, স্নেহভাজন আরশাদ রাইহানাও হযরতের সাথে ছিলেন তাঁরা তিনজন ভাতের দস্তরখানে বসতেন। হযরত অনেক সময় আমোদ করে বলতেন, ভাই! আমার সাথে দু'জন বাঙ্গালী আছে, তাঁদেরকে ভাত পরিবেশন করো।

দস্তরখানে প্রচুর পরিমাণ ভাত উপস্থিত থাকত। কারণ, এই সমাবেশটিই ছিল বাঙ্গালীদের। তারা ছিলেন ভাতে অভ্যস্ত। অবশ্য সেথায় পরোটা পাকানোর রেওয়াজও ছিল তবে সাদা চাপাতি সম্পর্কে না কারো জানা ছিল, আর না তা পাকানো হত। গোশত ইত্যাদির সাথে কোন না কোন মিষ্টির ব্যবস্থাও দস্তরখানে থাকত। হালুয়া, শাহী টুকরা, মিষ্টি, ইত্যাদি ছাড়াও পেঁপে অন্যান্য ফল-ফ্রুট থাকত। সেমাই এত আড়ম্বরের সাথে পাকানো হত যে, এদিকের লোকদের চেনাই দায় হয়ে যেত। কাঁচা লংকা চিরে দরস্তরখানে রেখে দেয়া হত। মাছের দেশ হওয়া সত্ত্বেও কেন যেন দস্তরখানে মাছের ব্যবস্থা থাকত না। বাঁশ দ্বারা তৈরী নতুন ধরণের তরকারি একদিন দেখতে পেলাম। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম কচি বাশ দ্বারা এ তরকারি পাকানো হয়।

দেওবন্দে বা এখানেও সাধারণ দস্তরখানে হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর অভ্যাস ছিল, আরবদের মতো বড় একটি খানচায় তরকারি রেখে তার চতুর্পার্শ্বে সকলে বসে পড়তেন। একটি কাপড়ে গরম গরম চাপাতি হযরতের পাশে মোড়ানো থাকত তা থেকে হযরত প্রয়োজন অনুপাতে মেহমানদেরকে দিতে থাকতেন। কেউ তার প্লেটে খানা ছেড়ে গেলে হযরত তা মুছে খেতেন ফলে আমরাও এর এহতেমাম শুরু করেদিলাম। হযরত দুই পা বিছিয়ে খেতেন। বাম হাতে একটি চাপাতি নিতেন এবং ছোট ছোট টুকরো করে খেতেন। সবার আগে শুরু করতেন আর সবার পরে শেষ করতেন। খানা শেষে সকল মেহমানরা চা পান করতেন। এটি হচ্ছে দাওয়াতে খেলে সেখানকার খানার বিবরণ।

আর দাওয়াত না থাকলে মাগরিব নামায থেকে বাহির হওয়ার পর সোজা হুজরাখানায় তশরীফ নিয়ে যেতেন। আগ থেকেই খানা প্রস্তুত

থাকত। যথারীতি ভাতে অভ্যস্ত ও হযরতের সঙ্গী রুটি খানেওয়ালাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দু'টি দস্তরখান বিছানো হত। বাড়ীতে খানা খেলে ইশার পূর্বে কিছু সময় পাওয়া যেত। তখন হযরত কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। সঙ্গীরা ইলমী বা সংবাদপত্রের কোন খবর নিয়ে আলাপ জুড়ে দিত। হযরতও এতে শরীক হতেন। পরে কিছুক্ষণ আরাম করতেন।

এটা তো সকলেরই জানা যে, হযরত মাদানী কুদ্দিসা সিররুহুর বিশেষ ধরনের বাচন ভঙ্গি ও নামাযের একাগ্রতা ও খুশু-খুযু শুধু হিন্দুস্তানেই নয়, বরং আরব ভূমিতেও প্রসিদ্ধ স্বীকৃত। সিলেটে তারাবীসহ প্রত্যেক নামাযের ইমামতী হযরত রহ.-ই করতেন। হযরতের পিছে তারাবীহ পড়ার জন্য অনেক দূর-দুরান্ত থেকে লোকজন এসে ভিড় জমাত। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ হযরতের পিছে পড়ে সকাল বেলা তারা আপন আপন গন্তব্যে ফিরে যেত। হযরত মাদানী নওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর কেরাত ও নামায সম্পর্কে মৌলভী আবদুল হামীদ সাহেব যা কিছু লিখেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হযরতের পিছে নামায পড়ার সুযোগ তো এ অধমের হযরত শায়খুল হাদীসের বহুবারই হয়েছে। তবে মাহে মোবারকে হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক কখনো হয়ে উঠেনি। অবশ্য তারাবীহ দু'বার ইক্তেদা করার সুযোগ হয়েছে। প্রথমবার ১৩৬৩ হিজরীর রমযানে। যখন হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর ইলাহাবাদ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৪ই রমযান রবিবার সকালে সাহারানপুর পৌছে ঐদিনই দেওবন্দ রওনা হয়ে যান। এক রাত্র দেওবন্দে অবস্থান করার পর সোমবার দুপুর বারটার দিকে দিল্লী চলে যান। যেহেতু ঐ বছর ২১শে রজব সকালে হযরত চাচাজান মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস রহ. (তাবলীগ জামাতের প্রধান) ইন্তেকাল করেছিলেন, তাই হযরত মাদানী কুদ্দিসা সিররুহু দিল্লী পৌছে বাদ মাগরিব সবাইকে শান্তনা দেয়ার মানসা নিজামুদ্দীন তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তারাবীর সময় হযরত বললেন, যিনি বরাবর তারাবীহ পড়াচ্ছিলেন আজকেও তিনি পড়াবেন। আমি হযরত শায়খুল হাদীস রহ. কে আরজ করলাম, আপনার সামনে তারাবীহ পড়ানোর হিম্মত কার আছে? আজকের তারাবীহ তো আপনাকেই পড়াতে হবে। কিছুক্ষণ মোড়ামুড়ি করার পর হযরত কবুল করে নিলেন এবং ঐ রাতে নিজামুদ্দীনের তারাবীর ইমামতী হযরতই করলেন। নিজের তারাবীতে কালামে পাকের যতটুকু পড়া হয়েছিলো তারপর থেকে পড়লেন। অর্থাৎ চৌদ্দতম পারার মধ্যখান থেকে

সূরা বনী ইসরাইলের শেষ পর্যন্ত বিশ রাকাতে মোট এক পারা এত ধীরস্থির ভাবে পড়ালেন যে, মজাই লাগতে ছিল। দ্বিতীয়বার পরবর্তী বছর অর্থাৎ, ১৩৬৪ হিজরীর রমযানের প্রথম রাতের তারাবীহ হযরত সাহারানপুর স্টেশনে পড়িয়েছিলেন। ২৯শে শাবান রাত চারটায় বুখারী শরীফ খতম হয় এবং ঐদিন বিকালেই লরীযোগে দেওবন্দ হতে স্বপরিবারে সাহারানপুর পৌছেন। রাত বারটার দিকে তিনি সাহারানপুর স্টেশনে বিরাট এক জামাতের সাথে তারাবীহ আদায় করেন। সাহারানপুর মাদরাসা ও শহরের বহুলোক নিজ নিজ স্থানে তারাবীহ পড়ে হযরতের পিছে নফলের নিয়তে শরীক হচ্ছিল। এ অধমকে হযরত বললেন, আমার নিকটে দাঁড়াও আজ তোমাকেই শ্রোতা হতে হবে। আমি বললাম, আপনাকে লোকমা দেয়া কি কোন সহজ ব্যাপার? এখানে অনেক হাফেয উপস্থিত আছেন। ভাল একজনকে ডেকে আনি? হযরত আমার আরযী কবূল করলেন না। ফলে ঐ রাতে হযরতের সাথী হওয়ার গৌরব এ অধমের হয়েছিলো। ({শায়খুল হাদীস হযরত মাও. মুহাম্মাদ} যাকারিয়া)

মৌলবী আবদুল হামীদ সাহেব আরো লিখেন, যেহেতু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন হযরতের পিছে তরাবীহ পড়ার জন্য এসে ভিড় জমাত, তাই আযান পড়ার সাথে সাথে মসজিদ ভরে যেত। যারা পরে আসত তারা জায়গা পেত না। মুছল্লা পর্যন্ত হযরতের তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝে একটু পথের মতো জায়গা খালী রেখে দেয়া হত। মসজিদে আসার সময় মুতাওয়াল্লী সাহেব পূর্ব হতে পানি ভর্তি একটি গ্লাস নিয়ে হযরতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। কারণ, হযরত ঘর থেকে চা পান করত। মুখে একটি পান পুরে মোটর গাড়িতে করে তাশরীফ আনতেন এবং কুলি করে সোজা মুছাল্লার ওপর গিয়ে দাঁড়াতেন। ভিড়ের দরুণ এক দু'জন মুকাব্বির নিযুক্ত করতে হত। শেষ দশ দিন মুকাব্বিরের সংখ্যা আরো বাড়াতে হত। তারাবীতে আড়াই পারা কুরআনে পাক এভাবে পড়তেন যে, প্রথম চার রাকাতে মাওলানা আবদুল জলীল সাহেব সোয়া পারা পড়তেন। পরে এই সোয়া পারাই হযরত বাকী ষোল রাকাতে পড়তেন। চার রাকাত পরপর লম্বা সময় বিশ্রাম নিতেন। তারাবীর মধ্যে কুরআনে পাক পড়তে পড়তে অনেক সময় হযরতের মধ্যে এক ধরণের জোশ সৃষ্টি হত। ঐ সময়ের তিলাওয়াতে যে কি মজা পাওয়া যেত তা শ্রোতারাই কেবল বলতে পারবে। তারাবীহ শেষে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতেন। এতে হাজেরীনদের মধ্যে এমন

কান্নার রোল পড়ে যেত যে, অনেক সময় সারা মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। অতঃপর সঙ্গী ও ভক্তদেরকে নিয়ে সেখানেই চা পান করতেন। প্রায় দশ মিনিট পর হযরত কুদ্দিসা সিররুহু ওয়াজ করতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আপন আপন মসজিদের নামায সেরে অনেক মানুষ তথায় হযরতের ওয়াজ শোনার জন্য আসতে থাকত সারা মসজিদে তিল পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা থাকতনা। ফলে অনেক লোক মসজিদে প্রবেশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওয়াজ শুনতে থাকত। সেখান পর্যন্ত আওয়াজ পৌছতো না বিধায় মাইকের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। যারা ঐ ওয়াজে শরীক হত তাদের সংখ্যা হাজারের উর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও নিরবে তাদের কাছে চা পৌছে যেত। এত বড় সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও কোন শোরগোল হত না এবং চা পান থেকে কেউ বঞ্চিতও হত না। হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু যখন চা পান থেকে ফারিগ হয়ে যেতেন ততক্ষণে অন্যান্যদের চা পানও শেষ হয়ে যেত। তখন শুধু আমলী ওয়াজ হত। রাজনীতির ওপর বেশী কথা হত না। অবশ্য কথার ফাঁকে টাটনী স্বরুপ দু'একটি বাক্য এসে যেত। ওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন সম্বলিত কাগজ এসে হযরতের কাছে জমা হতে থাকত। পরে হযরত তার বিস্তারিত উত্তর প্রদান করতেন। অর্ধেক রমযানের পর থেকে হযরত অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যান্যরা ওয়াজ করেছিলেন। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ওয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হযরত মজলিসে বসে থাকতেন। ঘন্টা খানেক ওয়াজের পর মুছাফাহ শুরু হয়ে যেত। ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গাড়ি পর্যন্ত পৌছতে অনেক দেরী হয়ে যেত।

ঘরে আসার পর হালকা নাশতা পেশ করা হত। হাজেরীনরাও এতে শরীক হতেন। রাত দেড়টার দিকে এ মজলিস খতম হত। অতঃপর হযরত হুজরা শরীফে চলে যেতেন। সেথায়ও বিশিষ্ট লোকদের সাথে কোন কোন বিষয়ে আলাপ চলত। পরে প্রায় আধঘন্টা আরাম করে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন।

এ অধমেরও বার বার পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছে যে, স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত সাহারানপুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর ও হযরত মাদানী কুদ্দিসা সিররুহুর ঘুম এত নিয়ন্ত্রণে ছিল যে, ইচ্ছা করলে শুয়ার সাথে সাথেই তাঁদের ঘুম এসে যেত এবং ঘুম ত্যাগের ইচ্ছা করলে কোনরূপ এলার্ম বা ডাকাডাকি ছাড়াই জেগে যেতেন। আপবীতীর মধ্যে এসব কথা খুব বিস্তারিতভাবে লিখে এসেছি। ({শায়খুল হাদীস হযরত মাও. মুহা.} যাকারিয়া)

ঘুম থেকে জেগে জরুরত থেকে ফারিগ হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। তাহাজ্জুদে শরীক হওয়ার জন্য দূর-দুরান্ত থেকে যারা আসার ছিল, তারা অনেক আগেই পৌছে যেত। এতটুকু যাদের সম্ভব হত না প্রথম রাকাতে তো অবশ্যই এসে শরীক হত। তাহাজ্জুদে কুরআনে পাক দুই খতম করার অভ্যাস ছিল। এক খতম হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু নিজে পড়তেন। তাহাজ্জুদে যাওয়ার সময় হযরত খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেন আওয়াজ না হয় এবং কারো ঘুম না ভেঙ্গে যায়। অবশ্য আগ্রহের চোটে সকলেই জেগে যেত।

তাহাজ্জুদের পর সাহরীর সময় খুব কম বাকী থাকত। যার ফলে সাথে সাথে বাড়ীতে দস্তরখান বিছানো হত এবং সময়ের স্বল্পতার দরুণ আঙ্গুল ও মুখ দ্রুত খাওয়ার কাজে, চোখ ঘড়িতে আর কান মুয়াজ্জিনের আওয়াজের প্রতি ধ্যান করে থাকত। সাহরী শেষে হযরত কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করতেন। এরপর নামাযের জন্য প্রস্তুত হতেন। মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং আকাশ ফর্সা হলে নামায শুরু করে দিতেন। তবে শেষ দশকে এতেকাফ অবস্থায় অন্ধকার থাকতেই নামায শুরু করতেন এবং শেষ করতে করতে আকাশ ফর্সা হয়ে যেত। যারা বাড়ীতে যাওয়ার ছিল তারা বিদায়ী মুছাফাহ করে রওয়ানা হয়ে যেত। অতঃপর হযরত তাঁর আবাসস্থলে চলে আসতেন এবং সাথে সাথে শুয়ে যেতেন। দু'একজন খাদেম শরীর টিপে দিত এবং মাথায় তেল লাগিয়ে দিত। অনেক সময় কথা বলতে বলতেই হযরত ঘুমিয়ে পড়তেন। অন্যান্য সাথীরাও তখন ঘুমিয়ে পড়ত। হযরত অল্পক্ষণ আরাম করার পর জরুরত থেকে ফারিগ হয়ে কুরআনে পাক তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। পূর্ব হতে যাদেরকে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া থাকত, বেলা দশটা হতে তাদের আগমণ শুরু হয়ে যেত। সাক্ষাতের মধ্যে দিয়েও কিছু সময় পেলে পুনরায় তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। চিঠি পত্রের উত্তরও তখন লিখতেন। বিশেষ কোন আলাপ যাদের থাকত তাঁরাও তখন হাজির হতেন। এ সিলসিলা জোহর পর্যন্ত চলতে থাকত। সময় পেলে জোহরের পূর্বে আধা ঘন্টার মতো আরাম করে নিতেন।

ঐ বছর হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাচ্ছিল। অর্ধেক রমযান থেকে জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই খাদেমদের কেউ শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে এতেকাফ সম্পর্কে আরয করলেন, হযরত! এতেকাফে কষ্ট বেশী হবে। হযরত বললেন, না ভাই,

এতেকাফের যে নিয়ত করে ফেলেছি। মসজিদের এক কোনে হযরতের এতেকাফের কামরা বানানো হয়েছিলো। কিন্তু জ্বরের প্রকোপে নামাযের মধ্যে তাঁর শীত লেগে যেত। তখন হযরত চাদর জড়িয়ে নিতেন এবং ফ্যান বন্ধ করে দেয়া হত।

কোন কোন সময় নামাযের ফাঁকে ফাঁকে চা পান করে নিতেন। যেহেতু প্রথম বিশ দিনে শারীরিক অসুস্থতার দরুণ চার রাত জামাতে তাহাজ্জুদ শরীক হতে পারেননি, তাই খতম শেষ হতে অনেক বাকী ছিল। ফলে শেষ দশকে এসে হযরত ঐটি পুষিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন। তদুপরি মসজিদে অবস্থানরত লোকজনের ভীড়ের দরুণ হুজরাখানার ন্যায় নীরবতা এখানে ছিল না। একদিকে আমলের পরিমাণ বেড়ে গেল অন্যদিকে আরামের পরিমাণ কম হয়ে গেল। শেষ দশকে এসে লোকের সমাগম খুব বেড়ে গেল। মসজিদের বাইরে পথেও অনেককে থাকতে হত। যার ফলে বাদ-যোহর দরখাস্তের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিলো। বাইয়াতে ইচ্ছুক লোকদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। এমনকি তাদেরকে নম্বরসহ সিরিয়াল মত আসতে হত। বাদ-ফযর প্রস্থানকারীদের মুছাফাহার জন্যও পূর্বের তুলনায় বেশী সময় ব্যয় হত। মুছাফাহ শেষে হযরত এ'তেকাফ স্থলে চলে যেতেন এবং অল্প কিছুক্ষণ আরাম করতেন। অতঃপর সারা রাত অনিদ্রায় কাটানো এ'তেকাফকারী মেহমানরা যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়ে থাকত, হযরত তখন উঠে অত্যন্ত নরম পায়ে এস্তেঞ্জায় যেতেন এবং অযু সেরে আপন মা'মূলাতে মশগুল হয়ে যেতেন। ২৭শে রাত্র যেহেতু লোকজনের মাঝে শবে কদর হিসেবে প্রসিদ্ধ তাই ঐ রাত্রের ভীড়ের অবস্থা যে দেখেনি তাকে বলে বুঝানো দায়। যোহরের পর আবেদন পত্রের সংখ্যা বেড়ে গেল। তারাবীর পর দম করে নেয়ার জন্য পানির বোতল হযরতের মুছল্লার চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকত। বাদ-তাহাজ্জুদ হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু যখন দোয়ার জন্য হাত তুলতেন তখন কান্নার রোলে সারা মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। স্বয়ং হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর ওপর যে ঐশী হালত সৃষ্টি হতে দেখা গেল তা বর্ণনার উর্ধ্বে। ঐ রাতে শবে কদর হলো কিনা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর মজলিসে সে আলোচনা শুরু হলে অধম (মাওলানা আব্দুল হামীদ আজমী) হযরতকে বললাম, কদরের রাত্রে আল্লাহ ওয়ালাদের হাল বন্ধনমুক্ত হয়ে পড়ে, আল্লাহ জানে এ বছর কদরের রাত্র কোনটি ছিল? হযরত বললেন, আমার ধারণা মতে এ বছর

শবে কদর তেইশের রাত্রে ছিল। ত্রিশা রমযান বুধবার ঈদের চাঁদ দেখা গেল। মাগরিবের নামায আদায় করার পর হযরত আরাম স্থলে ফিরে আসলেন। ঈদের রাত্রও জামাতের সাথে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হল। তাহাজ্জুদ নামাযের কেয়াম এত দীর্ঘ করলেন যে, রমযানের কোন রাতে হযরত এত দীর্ঘ কেয়াম করেন নি। ঠিক সকাল সাড়ে নয়টায় ঐ মসজিদেই হযরত ঈদের নামায পড়ালেন।

হযরত আকদাস শাহ আবদুল কাদের সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মা'মূলাত

আপবীতীতে হযরতের বিভিন্ন দিক নিয়ে খুব আলোচনা করা হয়েছে। হযরত শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী ও হযরত আবদুল কাদের রায়পুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর জামানা অধম খুব বেশী পেয়েছি এবং ঐ দুই বুযুর্গের ভালবাসাও অধমের প্রতি এত বেশী যে, তা লিখে বুঝানো সম্ভব নয় বরং লক্ষ লক্ষ রয়েছে। এই দুই আকাবিরের জীবনী রচনাকালে অধমকে তার সাথী বন্ধুরা অনেক অনুরোধ করেছেন বটে, তবে ঐ সময় ইলমী ব্যস্ততা আমার উপর এত মারাত্নকভাবে চেপে বসেছিলো যে, চিন্তা করেও কিছু মনে করতে পারতাম না। এখন তো বেকার হয়ে পড়ে আছি আকাবিরদের কথা ও কাহিনী এখন সব সময় আমার মনে পড়তে থাকে এবং তা আমাকে কাঁদায় ও অস্থির করে তোলে। এখন যেদিকেই নজর করি সেদিকেই কবির ভাষা ও উপমা খুঁজে পাই। কবি বলেন,

তোমার গুণাগুণ সীমাহীন, কিন্তু আমার দৃষ্টির সীমানা সংকীর্ণ

তোমার বসন্তের ফুল কুড়ানীদের মুখে শুধুই সংকীর্ণতার অভিযোগ।

আমার মাখদুম আমার আঁকা, শায়খুল ইসলাম মাওলানা মাদানী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু মুখে তো কোনদিন একথা বলেননি যে, আমি হযরতের খিদমতে রমযান কাটাই, তবে ইঙ্গিতে আমি বার বার বুঝেছি যে, হযরতের মানসা ছিল, এ অধম যেন তার এখানে রমযান কাটায়। আর আমার মুহসিন ও মুনইম হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী তো জীবনের শেষ বছরগুলোতে তাঁর ওখানে রমযান কাটানোর জন্য অধমকে শুধু নির্দেশই দেননি বরং পীড়াপীড়িও করেছেন। কিন্তু কথায় العلم الحجاب

(ইলম হচ্ছে বড় পর্দা) তাই হযরত নাওয়ারাল্লাহুর জীবদ্দশায় অধমের ওপর এমন ইলমী পর্দা পড়েছিলো যে, ইলমী জ্ঞান সাধনায় কোন প্রকার ক্ষতি তখন বরদাশত হত না।

আপবীতীর কোথায়ও হয়তো উল্লেখ করে এসেছি যে শেষ জীবনে অধমের ওপর হযরত রায়পুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর স্নেহ এত বেড়ে গেল যে, আমার বিচ্ছেদ তাঁর জন্য কষ্ট বয়ে আনত। হযরতের খিদমতে এক আধ দিন অবস্থান করে বুখারী শরীফের সবকের ওযর দেখিয়ে ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত বারবারে যে কথাটি বলতেন তা আমাকে এখনো কাঁদাতে থাকে। হযরত বারবার বলতেন, বুখারী শরীফের সবক তো বহুত পড়াতে পারবে, কিন্তু আমাদেরকে কোথায় পাবে?

১৩৭৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরতের রোগ বেড়ে গেল। ফলে চিকিৎসা ও ডাক্তারের আসা যাওয়ার সুবিধার্থে হযরত কুদ্দিসা সিররুহু বহাটের কাংগরওয়ালী কুঠিতে অবস্থান করছিলেন। হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু যেহেতু অধমকে সীমাহীন মুহাব্বত করতেন তাই ঐ সময় অনেকদিন পর্যন্ত বৈকালে দ্বিতীয় ঘন্টায় আবু দাউদ শরীফের দরস সেরে দারুল হাদীস হতে সোজা বাস স্টেশনে চলে যেতাম। তৈরী বাস পেলে বহাটে নেমে আছর পড়তাম, আর বাস ছাড়তে দেরি থাকলে বাস স্টেশন মসজিদে আছর পড়ে বাসে চড়তাম। দৈনিক যাতায়াতের কারণে বাসওয়ালারাও আমাকে চিনে ফেলেছিলো। তাই তারা আমার জন্য দু'চার মিনিট অপেক্ষা করত। বহাটে পৌছে নামায আদায় করতঃ হযরতের খিদমতে হাজির হতাম। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ যে, আমাকে সোজা কাঙ্গরওয়ালী পৌছে দিয়ে পরে বহাটে এসে থামতো। মুসলিম অমুসলিম এমনকি শিখ ড্রাইভাররা পর্যন্ত এমন করত।

যাত্রিরা চিৎকার মারতে থাকত যে, আমরা বহাটে নামব আমরা বহাটে নামব। কিন্তু ড্রাইভার তখন যেন কিছু শুনতোই না। পরে আমাকে যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে এসে যাত্রিদেরকে বলত, ভাই দু'এক মিনিটে আর কি ক্ষতি হবে, বহাটে নামলে ঐ মাওলানা সাহেবকে দেড় মাইল পায়ে হেটে আসতে হত। রাতটুকু হযরতের খিদমতে কাটিয়ে কাকভোরে জলদি করে একটু চা মুখে দিয়ে প্রথম বাসে সাহারানপুর ফিরে আসতাম। এ তো এক দীর্ঘ কাহিনী যা এখন স্মৃতিপটে ভাসে ও আমাকে কাঁদাতে থাকে।

এখানে তো শুধু রমযানের আলোচনা চলছে। এ অধমের দুইটা আধো আধো রমযান হযরতের খিদমতে কেটেছিলো প্রথম ১৩৭৮ হিজরীতে হযরত কুদ্দিসা সিররুহু যখন সাহারানপুর ভেট হাউজে রমযান কাটান। বাদ যোহর নিজের পারা তিলাওয়াত শুনিয়ে ভেট হাউজে গিয়ে হাজির হত। আর হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে একেবারে তারাবীহ পড়ে ফিরে আসত। রমযানের বরকত ও কাহিনী তো অনেক। তবে এক দিনের দৃশ্য আমার সব সময় মনে থাকবে। হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর হুজরার এক কোনে এ অধমের বসার জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। ভাই আলতাফকে আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুক, তিনি মুতাকিফদের জন্য যেমন পর্দা দিয়ে হুজরা করা হয় আমার জন্যও তেমন পর্দা টানিয়ে দিয়েছিলেন। তার বরকতে খাট ও বিছানা সব সময়ই সেখানে প্রস্তুত থাকত। আমি চুপে চুপে হুজরা দিয়ে আপন জায়গায় চলে যেতাম। আছরের নামাযের সময় হযরতের সাথে সাক্ষাত হত। অধিকাংশ দিন আমার হাজিরির খবর হযরতের হত না। একদিন আমি আমার জায়গায় আসতে ছিলাম, হযরত তখন ভিতরে বসে কি একটি ঔষধ যেন খাচ্ছিলেন। আশে পাশে দু'চারজন খাদেম দাঁড়িয়েছিলেন। হযরতের হুজরা শরীফে তখন এত নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল যে, আমার মতো অন্তর্দৃষ্টিহীনও তা অনুভব করতে পেরেছিলো। মনে হচ্ছিল যে, হুজরার মধ্যে একটি সূর্য নেমে এসেছে। ইফতার পর্যন্ত আমি শুধু ঐ নিয়েই ভাবতে ছিলাম।

অনেকে রোজা ভেঙ্গে দিয়েও এত নূর এত বরকত লাভ করে যে, লক্ষ কোটি মানুষের রোজার মধ্যেও তা পাওয়া যায় না। এ অবস্থা আগেও আমি কখনো দেখিনি এবং পরেও না। ঐ দৃশ্যের, ঐ মাধুর্যের কথা মনে পড়লে আজও ঐশী স্বাদ অনুভব করি।

হযরতের নির্দেশ ছিল, আমার উপস্থিতির খবর যেন হযরতকে করা হয় কিন্তু আমি সঙ্গীদেরকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। কারণ এতে হযরতের একাগ্রতা ও ধ্যানের মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি হতে পারে। আমার মুহসিন দোস্ত স্নেহাস্পদ হাজী আবুল হাসানের সাথে এ রমযানেই সম্পর্ক হয়েছিলো। অনেক সময় তিনি খুব মজা নিয়ে প্রথম সম্পর্কের কাহিনী বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে থাকেন। আমার নিজেরও অনেক কথা খুব মনে আছে। তা সব যদি এখানে লিখতে যাই, তাহলে কম করে হলেও চার-পাঁচ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে, তদুপরি তা আকাবিরদের রমযান সংশ্লিষ্ট নয়। অবশ্য ঐগুলো বর্ণনা করতে আমারও মন চায় সুযোগ হলে কোথাও উল্লেখ করা হবে। ঐ বছর

হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর একান্ত স্নেহের শাহ মাসউদকে কুরআন শোনানোর হুকুম করেছিলেন। শাহ মাসউদও বড় সুন্দরভাবে বেশ উদ্দীপনার সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। ২৫শে রমযান কুরআন খতম হয়। বাকী চার রাত বিভিন্ন জনে কুরআন শুনিয়েছিলেন। যেহেতু হযরতের এখানে আওয়াল ওয়াক্তে তারাবীহ শুরু হত, আর মাদরাসার পুরাতন ভবনে ক্বারী মুজাফফার সাহেব তারাবীহ পড়াতেন, তাই ভেট হাউজ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে ক্বারী সাহেবের পিছে নফলের নিয়তে দু'চার রাকাত এ অধমও পড়ে নিতো।

ঐ সময় তারাবীর পর অধমের এখানে চা পানের খুব জোর ছিল। ফুলরী তো বাড়ীতেই পাক হত। এখন সেখান থেকে আরো যা কিছু আসত তা হত বাড়তি। জনাব মাওলানা আবুল হাসান আলী মিঞাও ঐ রমযানের অধিকাংশ সময় ভেট হাউজে কাটিয়ে ছিলেন। মাওলানা স্যার রহীম বখ্‌শ সাহেবের ভাতিজা জনাব সূফী আব্দুল হামীদ সাহেবও ছিলেন। এছাড়া হযরত কুদ্দিসাসিররুহুর অন্যান্য ভক্ত ও খাদেমদের অনেকেরই মামূল এই ছিল যে, হযরতের এখানে তারাবীহ পড়ে অধমের চা চক্রে এসে হাজির হতেন। প্রায় দু'ঘন্টা পর তারা ফিরে যেতেন।

দ্বিতীয় রমযান, যেটি ছিল হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর জীবনের শেষ রমযান। অর্থাৎ ১৩৮১ হিজরীর রমযান। তখন কয়েক মাস থেকেই হযরত তাগাদা করছিলেন আর বলছিলেন, মাদরাসাও থাকবে, বুখারী শরীফও থাকবে, কিন্তু আমরা কোথায় থাকব? ফলে এ অধমের মা'মূল এই হয়ে গেলে যে, প্রত্যেক শুক্রবার বাদ জুমা খানা খাওয়া ছাড়াই রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেতাম। আপবীতীর কোথাও হয়তো উল্লেখ করেছি যে, আমাকে খাওয়াতে পারলে নিজামুদ্দীন ও রায়পুরের উভয় হযরত খুবই আনন্দিত হতেন। ঐ দুই জায়গায় যাওয়ার একদিন পূর্ব হতে অধম খানাপিনা ত্যাগ করতাম। যা হোক জুমার পর সেখানে চলে যেতাম এবং দু'দিন অবস্থান করে সোমবার হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে ফযর নামায পড়ে চা পান করে সাহারানপুর ফিরে আসতাম। মাহে মুবারকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হল যে, অর্ধেক সাহারানপুর ও অর্ধেক রায়পুর কাটাতে হবে। সে হিসেবে ১৫ই রমযান রায়পুর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সংবাদ পেলাম যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (তাবলীগ জামাতের দ্বিতীয় হযরতজী)১৭ই রমযান আমার এখানে আসবেন। যার ফলে ১৫ই

রমযানের পরিবর্তে ১৭ই রমযান রায়পুর যেতে হলো। ঐদিন তিনি দিল্লী থেকে আসলেন এবং সাথে সাথে তাঁর গাড়ীতে করে আমরা উভয়ে রায়পুর পৌছে হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর দস্তরখানে ইফতার করি। মাওলানা ইউসুফ সাহেব তো দ্বিতীয় দিনই ফিরে আসলেন। কিন্তু অধম হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর খানকা শরীফে আযাদ সাহেবের পিছে একেবারে ঈদের নামায পড়ে সাহারানপুর ফিরে আসি। অবশ্য মধ্যখানে দু'দিন সাহারানপুর আসতে হয়েছিলো। ফিরে আসার পথে বহাট, বাড়ী ইত্যাদি গ্রামের লোকদের নতুন কাপড় পরে ইদগাহের দিকে যাওয়ার দৃশ্য আজও মনে আছে। কারণ, রায়পুরের খানকা শরীফে ইশরাকের ওয়াক্তেই ঈদের নামায পড়া হয়েছিলো। আর গ্রামে সাধারণতঃ এগারটা পর্যন্ত ঈদের জামাত হতে থাকে। যার ফলে রাস্তায় তাঙ্গা, ঘোড়ার গাড়ী , গরুর গাড়ী ইত্যাদিতে বসা বুড়ো, বাচ্চা ও যুবকদের রং বেরঙের জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাক ও উজ্জ্বল আনন্দের দৃশ্য হৃদয় পটে খুব ভেসে উঠে।

ঐ রমযানে বাগানের মসজিদে মৌলবী আবদুল মান্নান সাহেব দেহলবীর পুত্র মৌলবী ফজলুর রহমান কুরআনে পাক শুনিয়েছিল। আর গুজড়ানেওয়ালার মৌলবী আব্দুল মান্নান সাহেব শুনিয়েছিলেন হযরতের হুজরা শরীফের বরাবর হুজরায়। তার পিছে এ অধম ঐ বছর শেষ রমযানের তারাবীহ পড়েছিলাম আর নিজের খতম বাড়ীতে শুনিয়ে এসেছিলাম। ঐ বছর বাদ জোহর হযরত রায়পুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর এখানে নির্জনে মজা লুটার গুরুত্ব খুব বেশী ছিল। পেশাব পায়খানার জরুরতের খাতিরে এক দু'জন খাদেম ব্যতীত অন্য কারোর জন্য হাজিরির অনুমতি ছিল না। আওয়াল ওয়াক্তে ফযর নামায আদায় করে প্রস্থানকারীদের সাথে মুসাফাহ করে আরাম করতেন। দশটার দিকে ভিতরেই কিছু আহার করে নিতেন। ডাক্তারদের পক্ষ থেকে রোজা না রাখার কড়া নির্দেশ ছিল। কয়েক বছরের লাগাতার অসুস্থতার কারণে দুর্বলতাও সীমাহীন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারো সাহায্য ছাড়া একা একা পায়খানার পাদানীতে বসা পর্যন্ত মুশকিল হয়ে গিয়েছিলো। আর যেহেতু হযরত ঐ বছর পাকিস্তান চলে যাবেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছিলো, ফলে লোকজনের ভিড়ও ঐ বছর অসম্ভব রকমের ছিল। খানাপিনার পর চারজন মিলে হযরতের খাটটি বাইরে এনে রেখে দিতেন। উৎসুক ভক্তদের ভিড়

তখন পঙ্গপালের ন্যায় ঢেউ খেলতে থাকত। খাট দূরে থাকায় এ অধমকে বার বার ভিড়ের সাথে লড়তে হত।

বাইয়াতের সিলসিলাও খুব দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিলো। যতবার বাহিরে তশরীফ আনতেন ততবারই হাজার হাজার উৎসুক ভক্তরা বাগানের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে পড়তো। হাফেয আব্দুর রশীদ সাহেব রায়পুরী তাদেরকে বাইয়াত করাতেন। প্রথমে হযরত আস্তে আস্তে বিসমিল্লাহ পড়তেন। বাইয়াতের বাক্য লম্বা চওড়া হত না। বিসমিল্লার পর কালিমায়ে তায়্যিবা পড়ানো হত। অতঃপর গুনাহ থেকে তওবা ও নামাযের পাবন্দী এবং ইত্তিবায়ে সুন্নাতের তাকিদ করে বাইয়াত শেষ করা হত। আছরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হযরতের খাটিয়া বাইরেই থাকত। কয়েক বছর ধরেই আছরের পরের মজলিসে কোন না কোন দ্বীনী কিতাব পড়ে শোনানোর নিয়ম চালু হয়েছিলো। পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সফরকালেও তা বহাল থাকত। ঐ রমযানে হযরত খাজা মামূল রহ. এর চিঠিপত্র পড়ে শোনান হচ্ছিল। আযাদ সাহেব তা পড়তেন। আসল চিঠিগুলো তো ফার্সী ভাষায় ছিল। তবে মাওলানা নাযীম আহমদ ফরীদী আমরুহী সেগুলো উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, যা আল ফুরকান পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিলো, সেগুলো পড়ে শোনানো হত। লোকজনের সমাগম ছিল অনেক বেশী। যার ফলে মসজিদ মাদ্রাসার বিভিন্ন স্থানে ইফতারির ব্যবস্থা করতে হত। হযরতের চারপায়ীর নিকটে বিশিষ্ট মেহমানদের ইফতারের দস্তরখান বিছানো হত। পরে এই ছাপড়ায়ই হযরত ও বিশিষ্ট মেহমানরা মাগরিবের নামায আদায় করতেন। অন্যান্যরা আদায় করতেন মসজিদে। প্রায় আধা ঘন্টাপর বিভিন্ন স্থানে মেহমানদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করা হত। পরে চায়ের আসর বসত।

১৩৩৮ হিজরী থেকেই অধমের ইফতারের পর খানা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। শুধু খেজুর আর যমযমই ছিল অধমের ইফতার। আসল ইফতার শুরু হত তারাবীর পর। মাওলানা আলী মিঞা কুয়েতে সোমবার রাতে রমযানের চাঁদ দেখে রওনা হয়েছিলেন। মক্কা-মদীনা, দামেস্ক প্রভৃতি নগরীতে ঐ বছর মঙ্গল বার প্রথম রোজা হয়েছিলো কিন্তু পাক-ভারতে রোযা হয়েছিলো বুধবারে। আমার সহোদরার নাতি স্নেহভাজন সালমান ঐ বছর হাকীম আইয়ুব সাহেবের মসজিদে প্রথম কালামে পাক শুনিয়ে ছিল। বাদ মাগরিব চৌঠা শাওয়াল মাওলানা ইউসুফ সাহেব সাহারানপুর আসেন

এবং ৫ই শাওয়াল তাকে নিয়ে ভোর বেলা রায়পুর হাজির হলে রাও আতাউর রহমান সাহেব বললেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ মশওয়ারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। আপনি যেন তা অস্বীকার করে না বসেন। আমি বললাম, কিসের মশওয়ারা তা না জেনে ওয়াদা করতে পারছি না। পুনরায় তিনি বললেন, কথা তো হযরতই বলবেন, তবে আপনি যেন তার বিরোধিতা না করেন। আমি বললাম আসল কথা না জেনে কোন ওয়াদা করা যাবে না। তিনি বললেন, হযরতের পর এখানে সব সময় অবস্থানের জন্য হাফেয আব্দুল আজীজ সাহেবকে রাজী করেছি কিন্তু হযরত তা আপনার পরামর্শের ওপর মওকুফ রেখেছেন। আমি বললাম, এটা তো আমারও ইচ্ছা। সুতরাং এর পক্ষে আমি অবশ্যই কথা বলব। খানকায় পৌছার সাথে অধমকে হযরত কুদ্দিসা সিররুহু ঐ পরামর্শে ছিলাম। অনেকক্ষন পর্যন্ত আলোচনা চলল। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কিন্তু কেউ কেউ ঐ আলোচনার সত্যতা অস্বীকার করতে চায়। আমারও এমন কোন ঠেকা পড়েনি যে, খামখা ঐসব গোপন রহস্য ফাঁস করে দিব।

কিছুক্ষণ পর হাফেয সাহেবকে ওপর থেকে ডেকে আনা হল। আমি হাফেয সাহেবকে বললাম, হযরতের ইরশাদ আর আমারও একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু আপনার ব্যতিব্যস্ততা এত বেশী যে, তা ছেড়ে দেয়াও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুশকিল মনে হয়। হাফেয সাহেবের মধ্যে তখন তীব্র আবেগ কাজ করছিলো। তাই তিনি উত্তর দিলেন, আপনাদের দু'জনের নির্দেশের পর আমার পক্ষ থেকে কিভাবে অস্বীকার থাকতে পারে। আমি বললাম, চিন্তা করে বলুন। হাফেয সাহেবের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর তিনি ও রাও আতাউর রহমান সাহেব সেখান থেকে উঠে গেলে আমি হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বললাম, খানাপিনার সময় কি এ ফয়সালার কথা সকলকে জানিয়ে দিব? হযরত অনুমতি দিলেন। দস্ত রখান তখন বিছানো হয়ে গিয়েছিল। বাইরে এসে দস্তরখানে বসলাম এবং রায়পুরের গণ্যমান্য লোকদেরকে সবার আগে একত্রিত করলাম, এতক্ষণ যারা খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় ব্যতিব্যস্ত ছিল, তাদেরকে ডেকে মুবারক বাদ দিয়ে বললাম, হাফেয সাহেব স্বতন্ত্রভাবে এখানে থেকে যাওয়ার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে বরকতময় করুক এবং হাফেয সাহেবকেও এখানকার ফয়েয ও বরকত দ্বারা ধন্য করুক। এরপর খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেল। দিল্লী থেকে আগত মেহমানরা বাদ জোহর রায়পুর

হতে বহাটের সন্নিকট কানা নামক স্থানে এক ইজতেমায় তাশরীফ নিয়ে চলে গেলেন এবং বৃহস্পতিবার খুব ভোরে এ অধমকে নেয়ার জন্য গাড়ী এসে গেল। আটটার দিকে রওয়ানা করে নয়টার দিকে থানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের আখিরী দোয়া ও মুসাফাহায় শরীক হলাম। মাওলানা ইউসুফ সাহেব সেখান থেকে বারটার দিকে রওয়ানা করে কিছুক্ষণ সাহারানপুর অবস্থান করার পর তিনটার দিকে দিল্লী চলে যান।

হযরত নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু পাকিস্তান সফরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল বিধায় অধমের বারবার রায়পুর যাওয়ার সুযোগ হয়ে যায়। ১১ই শাওয়াল পুনরায় রায়পুর আসা হয়। ১৬ই শাওয়াল হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবও এ সংবাদ পেয়ে পুনরায় সাহারানপুর আসেন এবং অধমকে সেখানে না পেয়ে সাথে সাথে রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। হযরতের সফর মুলতবী হয়ে যাওয়ায় ১৭ই শাওয়াল রবিবার ভোরে অধমকে নিয়ে রায়পুর হতে ফিরে আসেন।

আলোচনা তো ছিল আকাবিরদের রমযান সম্পর্কে, তবে কথায় কথা চলে আসে। মাওলানা আলী মিঞা হযরত রায়পুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর জীবনী গ্রন্থে "রায়পুরের রমযান" শিরোনামে লিখেন, রমযানুল মুবারকে যেন বসন্তের হাট বসে যেত। পূর্ব থেকেই সকলে এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকত। চাকরিজীবীরা ছুটি গ্রহণ করত। কওমী মাদ্রাসার উস্তাদরা এ সময়টিকে গণীমত মনে করে হযরতের খিদমতে চলে আসত। সেখানে আলেম-হাফেযদের এক বিশাল সমাবেশ হয়ে যেত। ভারত বিভক্তির পূর্বে পূর্বপাঞ্জাবের খত্দ, খাদেম ও মাদ্রাসার ওলামায় কেরামদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল। রায়পুর ও তার আশেপাশের ভক্ত অনুরাগীরা অত্যন্ত খোলামনে মেহমান ও খানকার মুকীমদের জন্য ইফতারী, খানা ও সাহরীর ব্যবস্থা করত। হযরত রায়পুরী কুদ্দিসা সিররুহুর এখানে তাঁর শায়খের অনুসরণে মাহে মোবারকে সব মজলিস মুলতবী করে দেয়া হত। কথা-বার্তার জন্য বিশেষ কোন সময় নির্দিষ্ট ছিল না। চিঠিপত্রের জবাব দান পর্যন্ত বন্ধ থাকত। নামাযের সময় ছাড়া প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই একাকিত্বের মজা লুটতে থাকতেন। সময় ব্যয় করতে হয় এমন কোন মেহমান আসলে হযরতের কষ্ট হত। অসুস্থতার পূর্বে সবার সাথে একত্রে ইফতার করতেন। ইফতারের সময় খেজুর ও যমযমের এহতেমাম

করা হত। অসুস্থতার পূর্বে বাদ মাগরিব খানা ও চা সকলের সঙ্গেই খেতেন। ইশার আযান পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্য একটি মজলিস হত। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এতটুকু সময়ই মজলিসের জন্য ছিল। আযানের পর নামাযের প্রস্তুতি চলত। ঐ সময়ের মধ্যেই ওলামা হযরত যারা প্রথম কাতারে বসা থাকতেন তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হযরতের সাথে আলাপ করতেন। হযরত সেগুলো শুনতেন ও উত্তর প্রদান করতেন। ইশার পর আধা ঘন্টার মত সময় কোনদিন মজলিস হত, আবার কোনদিন আরামে ব্যয় হত। খাদেমরা তখন শরীর টিপতে থাকতেন। মসজিদ ও খানকা উভয় জায়গায় খতমে তারাবীর ব্যবস্থা ছিল। হাফেয তো অনেক ছিল। কিন্তু হযরত সবচেয়ে ভাল তিলাওয়াত কারীকে পছন্দ করতেন।

১৩৭২ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৩ ঈসায়ীতে হযরত মানসূরীতে রমযান কাটাতে ছিল। পঞ্চাশ-ষাটজন অনুরাগী ভক্ত সাথে ছিলেন। মৌলবী আব্দুল মান্নান সাহেব খতমে তারাবীহ পড়াচ্ছিলেন। তারাবীর পর হযরত কিছুক্ষণ খাদেমদের সাথে অবস্থান করতেন। ঐ বছর হযরতের মধ্যে খুব আনন্দ উচ্ছলতা ছিল। অনেকে সারা রাত ইবাদত করতে থাকতেন, মোট কথা দিনরাত (বেশ এটি) ঐশী প্রভাব অনুভব হত। দুর্বল ও কম হিম্মত ওয়ালারা পর্যন্ত মনে করত যে, (কবিতা)

শরাবখানার বঞ্চিত হয় না হযরতের এক খাদেম যে হযরতের সাথে রমযানের শেষ দশক কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলো, কিন্তু অসুস্থতা ও কম হিম্মতীর দরুণ তেমন কোন সাধনা ও মুজাহাদা করতে সক্ষম হয় নি। সে তার কোন এক বন্ধুর কাছে এ মর্মে পত্র লিখেছিলো।

রইল পড়ে শরাব ফরোশের দুয়ারে শালিক।

ভালই কেটেছে শরাব খোরের মাহে রমযান। (সাওয়ানেহে কাদেরী)

মাওলানা আলী মিঞা ঐ রমযানে ১৬ তারিখ শনিবার লাখনৌ হতে সোজা মানসূরী চলে আসলেন এবং একেবারে ঈদের পর প্রস্থান করেছিলেন।

আলী মিঞা অন্য এক স্থানে হযরত রায়পুরী নাওয়ারাল্লাহ মারকদাহুর আখেরী রমযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন।

আখেরী রমযান ও আখেরী পাকিস্তান সফর

১৩৮১ হিজরী মুতাবেক ১৯৬২ ঈসায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে রমযান শুরু হয়ে যায়। হযরত তখন রায়পুরে ছিলেন। হযরতের মারাত্মক পীড়াপীড়ির কারণে এর কয়েক মাস আগ থেকে হযরত শায়খুল হাদীস সাহেবের মা'মূল এমন হয়েছিলো যে, জুমার নামায পড়ে রায়পুর চলে আসতেন এবং সোমবার ভোরে ফিরে যেতেন। রমযানে যেহেতু প্রতি সপ্তাহে এভাবে আসা যাওয়া করা মুশকিল ছিল তাই সিদ্ধান্ত হল অর্ধেক রমযান তিনি সাহারানপুর ও বাকী অর্ধেক রায়পুর কাটাবেন। ১৩৮১ হিজরীর ১৭ই রমযান হযরত শায়েখ সে মতে রায়পুর তশরীফ নিয়ে যান। মৌলবী আব্দুল মান্নান সাহেব দেহলবীর পুত্র মৌলবী হাফেয ফযলুর রহমান সাহেব সে বছর তারাবীতে খতম শোনাতেন। মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেব গমথলবী রমযানের পূর্বেই এখানে এসে গিয়েছিলেন। কারো ধারণাও ছিল না যে, এটাই হবে হযরতের আখেরী রমযান এবং শুধু রায়পুরই নয়, বরং এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে যাওয়ার সময় হযরতের ঘনিয়ে এসেছে। আছর হতে মাগরিব পর্যন্ত কোন দ্বীনী কিতাব পড়ে শোনানো হত। আল ফোরকানে প্রকাশিত হযরত খাজা মামূম সাহেবের চিঠিপত্রগুলো সে বছর পড়া হয়েছিলো। মেহমানদের অসম্ভব ভিড় ছিল এবং দিন দিন তা শুধু বেড়েই চলেছিলো। ঈদের নামায মসজিদেই আযাদ সাহেবের ইমামতীতে আদায় করা হয়। বাদ নামায একটি কুরছীতে বসিয়ে হযরতকে যখন তাঁর পীর ও মুর্শিদের মাজারে নিয়ে যাওয়া হল তখন এক বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা হল। অবস্থার ভাষায় যেন হযরত একথা বলছিলেন।

اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ خَلَفٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

আপনারা আমাদের অগ্রবর্তী। আমরা আপনাদের অনুগামী। আল্লাহ চাহেন তো অতিসত্বর আপনাদের সাথে আমরা মিলতে আসছি। হযরতের সব সময়কার ফিকির এটাই ছিল যে, দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও যেন এ মাদরাসা ও খানকা জারি থাকে। এ উদ্দেশ্যে কয়েকবার পরামর্শও হয়েছিলো। বিভিন্ন সময়ে নানা প্রস্তাবও সামনে এসেছিলো। কিন্তু কোনটাই আস্থাযোগ্য ও প্রশান্তিদায়ক হয় নি। এ উদ্দেশ্যেই আখেরী রমযানের কিছু পূর্বে মাওলানা হাফেয আব্দুল আজীজ সাহেবকে পাকিস্তান থেকে ডেকে

আনা হয়েছিলো। কুঠির ওপর তলায় তখন তিনি অবস্থান করতেন এবং অত্যন্ত উঁচু সাহসিকতার সাথে রমযানের মা'মূলাত আদায় করতেন। রায়পুরের খানকা আবাদ রাখতে হলে একজন বলিষ্ঠ ও যথোপযুক্ত ব্যক্তিত্বের নির্বাচন ও নিযুক্তির প্রয়োজন ছিল। মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেব হযরত শাহ আব্দুর রহীম সাহেব কুদ্দিসাসির্‌রুহুর আপন নাতি এবং ঐ খানকাওয়ালা শানের নয়নমনি ছিলেন আলেম ছিলেন, নেক ছিলেন, শরীয়ত পুজারী ছিলেন। হযরতের মুরীদ ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাফতও লাভ করেছিলেন। তাঁর স্নেহ-মায়ায় শিক্ষাদীক্ষা পূর্ণ করেছিলেন। ১৯০৫ ঈসায়ীতে তাঁর জন্ম। বড় হযরত রায়পুরী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর জীবদ্দশায়ই কালামে পাক হিফয করে ফেলেছিলেন রমযানে রায়পুরেই কুরআনে পাক শুনিয়েছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাজাহেরে উলূম মাদরাসায় শিক্ষা ল্যাভ করেন। ১৩৪৩ হিজরী সনে দাওরা হাদীস পড়েন। ১৯৫৭ ঈসায়ীর সেই মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় অত্যন্ত সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সাথে পূর্ব পাঞ্জাবের অবস্থার মুকাবিলা করতে থাকেন এবং মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্যের মাধ্যম হয়ে যান। পরে সরকারীভাবে যখন ঐ এলাকাটি খালী করানো হয় তখন মুসলমানদের পুরো কাফেলা নিয়ে পাকিস্তান চলে যান এরং সারগোধায় বসবাস শুরু করেন। أَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَهُ (আল্লাহ পাক তাঁকে দীর্ঘজীবী করুক)

রায়পুর এবং আশপাশের মুসলমানরা তাঁকে খুব চিনতেন এবং তাঁর সাথে সম্পর্কও ছিল। নিজের খান্দানী সম্পর্ক নিকটাত্মীয়তা এবং খোদাদাদ মর্যাদার সাহায্যে এই জামাতকে একত্রিত রাখার যথেষ্ট যোগ্যতা তিনি রাখেন। তাই হযরত রহ. তাঁকেই স্থায়ীভাবে রায়পুর রেখে যাওয়ার ফয়সালা করেন। রমযানের পর ১৩৮১ হিজরীর প্রথম সপ্তাহে খানকায় অবস্থানরত হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব (দাঃ বাঃ) হযরতের ইরশাদানুসারে সকলকে ডেকে বলেছিলেন, এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য হাফেয সাহেবকে হযরত মনোনীত করেছেন এবং হাফেয সাহেবও তা কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহ একে মুবারক করুক। আমাদের বড় চিন্তা ছিল যে, হযরতের এ সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায় কিনা। কিন্তু আল্লাহ পাকের শুকর, এখন আশা করা যায় এ স্থানটি আবাদ থাকবে এবং হযরতের সিলসিলাও বহাল থাকবে। (সাওয়ানেহে হযরত রায়পুরী)

আলী মিঞা অন্য এক জায়গায় লিখেন, পাকিস্তান সফরকালে অনেক সময় মাহে রমযান এসে যেত। পাকিস্তানে অবস্থানরত হযরতের খাদেম ও ভক্তদের তামান্না ও চেষ্টা এই হত, যেন হযরত তাদের ঐখানে রমযান কাটান, যাতে করে তাদের রমযানের উজ্জ্বলতা ও বরকত দ্বিগুণ হয়ে যায়। মৌসুম ছিল গরমের। ১৩৭১ হিজরীর রমযান মারি উপত্যকায় সূফী আব্দুল হামীদ সাহেবের কুঠিতে কাটিয়েছিলেন। ১৩৭৩ হিজরীতে জনাব মুহাম্মাদ শফী সাহেব কুরাইশী ও মালিক মুহাম্মাদ দ্বীন সাহেবের আন্তরিক দাওয়াত ও অনুরোধে গোড়াগলিতে মারি উপত্যকায় রমযান কাটান মেহমান সংখ্যা একশ'র উর্ধ্বে ছিল। বড় আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তারা মেহমানদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৩৭৪ হিজরীর রমযান মাসও গোড়াগলিতে কাটান। পরের বছর অর্থাৎ ১৩৭৫ হিজরীর রমযান লায়লপুরে কাটান। মেহমান সংখ্যা দু'শ পর্যন্ত পৌছে যায়। ১৩৭৬ হিজরীর রমযান লাহোর কাটান। কমিশনার জনাব চৌধুরী আব্দুল হামীদ সাহেব মরহুম মেহমানদারীতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৩৭৮ হিজরীতে পুনরায় লায়লপুর রমযান কাটান। এরপর আর পাকিস্তানে রমযান কাটানোর সুযোগ হয়নি। জীবনের শেষ দু'রমযান ১৩৮০ ও ৮১ হিজরীতে রায়পুর কাটান। (সাওয়ানেহে হযরত রায়পুরী)

ওপরে বলে এসেছি যে, ১৩৭২ হিজরীর রমযান মানসূরীতে কাটিয়েছিলেন। আলী মিঞার প্রবন্ধ থেকে ১৩৭৭ হিজরীর রমযানের কথা বাদ পড়ে গেছে। ঐ রমযানও হযরত লাহোরে সূফী আব্দুল হামীদ সাহেবের কুঠিতে কাটিয়েছিলেন। আলী মিঞা হযরতের জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১৩৭৮ হিজরীর রমযান হযরত লায়লপুর কাটিয়েছিলেন। তিনি এই তথ্য আমার দিনপঞ্জি থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লেখক বা অন্য কারো থেকে তথ্য ভুল হয়ে গিয়েছিল। আর লায়লপুরে কাটিয়েছিলেন ১৩৭৯ হিজরীর রমযান।

হযরত মাওলানা মুহম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মা'মূলাত

মাহে মুবারকে আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর বিশেষ কোন নেযাম ছিল না। আপবীতীর বিভিন্ন জায়গায় তাঁর নানা অবস্থার কথা উল্লেখ করে এসেছি। গঙ্গুহে অবস্থানকালে ১৩২৮ হিজরী পর্যন্ত আব্বাজান

রমযানে কোথাও সফর করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। পূর্বে লিখে এসেছি যে, ১৩২২ হিজরীতে হযরত ইমামে রব্বানী কুতুবে আলম গাঙ্গুহী রহ. এর জীবনের শেষ রমযানে তারই নির্দেশে আব্বাজান সেখানে তারাবীতে কালামে পাক শুনিয়েছিলেন। তিনি বলতেন সাত বছর বয়সে হিফয করার পর এই বারই হযরতের ভয়ে ২৯শে শাবান প্রথম দিন সোয়া পারা কুরআনে পাক দেখে দেখে পড়েছিলাম। পরের দিন ভয় দূর হয়ে যায়। ফলে আর দেখে পড়ার প্রয়োজন পড়েনি। একাধিক বার উল্লেখ করে এসেছি যে, আব্বাজানের নিকট কালামে পাক মুখস্ত পড়ার খুব এহতেমাম ছিল। কুতুবখানার কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। কিতাব নামানো, প্যাকেট বাঁধা, ঠিকানা লিখা ইত্যাদির মধ্য দিয়েও নিরবচ্ছিন্নভাবে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হযরত গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররুহুর বর্ণনায় উল্লেখ করে এসেছি। সাহারানপুর অবস্থানকালে এক বছর ব্যতীত কখনো পুরা রমযান সেখানে কাটিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না। ১৩৩২ হিজরীতে পুরাতন ছাত্রাবাস মসজিদ নির্মাণের পর আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সাহারানপুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর ইরশাদে সেখানে প্রথম তারাবীহ শোনান।

সাহারানপুর অবস্থানকালে মাদরাসার সবকের সময় ব্যতীত অধিকাংশ সময় হাকীম ইয়াকুব সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন মুচী মসজিদে কাটাতেন এবং সেখানেই ইফতার করতেন। ইফতারিতে খাস কোন জিনিসের এহতেমাম ছিল না। খেজুর যমযম থাকলে এটিকেই প্রাধান্য দেয়া হত। অন্যথায় যা মিলত তা দ্বারাই ইফতার করা হত। হযরত সাহরানপুরী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর দরবারে খেজুর ও যমযমের খুব এহতেমাম ছিল। যে সমস্ত হাজীগণ খেজুর ও যমযম হাদীয়া নিয়ে আসতেন সে গুলোকে খুব যত্ন সহকারে বোতল ও ডিব্বায় রেখে দিতেন। বর্তমান সময়ে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার ফলে প্রচুর পরিমান খেজুর যমযমের যে ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন তখনকার যুগে এ কল্পনাও করা যেত না।

আব্বাজান বাদ মাগরিবের নফল সংক্ষেপে পড়ে বাসায় চলে আসতেন। জামাতের সাথে খেতে গেলে সময় বেশী ব্যয় হবে, রমযান মাসে যেটি ঠিক নয়, তাই এক দু'জন দোস্ত বা কোনদিন শুধু একা একাই খুব সংক্ষেপে খানা থেকে ফারিগ হয়ে যেতেন। অতঃপর একটি চারপায়ীতে শুয়ে পড়তেন এবং

আস্তে আস্তে তারাবীর পারা পড়তে থাকতেন। দিনভর যেটা পড়তেন তা ছিল ভিন্ন খতম। তারাবীর পারা তাকে শুধু তখনই পড়তে দেখেছি। আগেও বলেছি যে, তারাবীর জন্য তাঁর কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। তারাবীর পর কিছুক্ষণ আরাম করতেন। ঘুম কম হওয়ার কষ্ট আব্বাজানেরও সব সময় ছিল। ঘুম না আসলে বা চোখ খুলে গেলে তিলাওয়াত করতে থাকতেন। একেবারে শেষ সময়ে সাহরী খেতেন। সাহরীতে কোন জিনিসের পাবন্দী ছিল না। দুধ, চা বা এ জাতীয় অন্য কিছু বাধ্যতামূলক ছিল না। ঘরে যা পাক হত তাই খেয়ে নিতেন। তবে আমাদের সারা খান্দানে সাহরীতে ঘি-ভাজা রুটি ও কোপ্তার খুবই ইহতেমাম ছিল। সে হিসেবে অধিকাংশ সময় আমাদের ঘরেও তা পাক হত।

আপবীতীর কোন এক জায়গায় উল্লেখ করে এসেছি, আমাদের খান্দানের বড়দের মসজিদে দু'কাতার নামাযীদের মধ্যে এক মুয়াযযীন ব্যতীত সকলেই হাফেযে কুরআন ছিলেন। একান্ত ছোট বয়সে ও মুয়াযযীন কোথা থেকে যেন পালিয়ে এসেছিলো। লাওয়ারিছভাবে ঘুরা-ফিরা আর ভিক্ষা করে ফিরত। বড়রা বুঝালেন, ভিক্ষা করে ফিরার চেয়ে ভাল হচ্ছে আমাদের এ মসজিদেই তুমি থেকে যাও। আযান দিবে, মসজিদ ঝাড়ু দিবে দু'বেলা খানা ও কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এভাবে তাকে রেখে দেয়া হল এবং ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই সে মুয়াযযীন হয়ে থাকলো। আমোদ করে তাকে বলা হত, আসের মোল্লা? তুমিই আমাদেরকে ডুবিয়েছো। অন্যথায় এ মসজিদের কোন মুসল্লীই হাফেয ছাড়া নেই।

প্রায় ইশা পর্যন্ত তারা নফল ও অন্যান্য অযীফায় লিপ্ত থাকতেন। ইশার কিছু পূর্বে সকলে বাড়ী চলে যেতেন। বাড়ী ছিল মসজিদের আশেপাশে। অযু-ইস্তিঞ্জা সহ সকল জরুরত থেকে ফারিগ হয়ে পুনরায় সমজিদে জমা হয়ে যেতেন। ইশার নামায সকলেই মসজিদে আদায় করতেন। অতঃপর যুবকেরা আপন আপন ঘরে পৌছে যেত এবং সাহরী পর্যন্ত নফল চলতে থাকত। এ মাসআলার ওপর খুব আমল ছিল যে, নফলে মুক্তাদী তিনজনের বেশী হতে পারবে না। তাই মহিলা মুসল্লীরা পালাক্রমে শরীক হতেন এবং হাফেযরাও পালাক্রমে পড়াতে থাকতেন। চার রাকাত অমুক অমুক আত্মীয়কে নিয়ে অমুক জায়গায় পড়া হবে এবং পরের চার রাকাত অমুক জায়গায় অমুকদেরকে নিয়ে পড়া হবে - এভাবে সাহরী পর্যন্ত চলতে থাকত। সাহরীর সময় বড় ছোট নারী পুরুষ সকলে আপন আপন ঘরে চলে

যেত এবং ঘরের সবাই মিলে সাহরী খেত। সাহরীতে ঘি-ভাজা রুটি ও কোপ্তা অবশ্যই থাকতো। মালীদার ব্যবস্থাও থাকত। একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মালীদা দেরীতে হজম হয় । ফলে রোজায় ক্ষুধা লাগে না। আযানের পর আওয়াল ওয়াক্তে ফজর নামায আদায় করে গভীর ঘুম থেকে উঠে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত দেখে দেখে কালামে পাক তিলাওয়াত করতে থাকতেন। কেউ তো লাগাতার পড়তে থাকত। আবার কেউ তারাবীহ ও নফলের পারা বারবার পড়তে থাকত।

ফাযায়েলে রমযানের বিভিন্ন স্থানে এবং ফাযায়েলে কুরআনে লিখেছি যে, আমাদের পরিবারের মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে আমার মেয়েরা আল্লাহ পাক তাদেরকে আরো শক্তি ও সাহস দান করুক। খানা পাক করা ও বাচ্চাদের লালন পালনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েও সারা রাত হাফেযদের পিছে কালামে পাক শুনে শুনে কাটায়। অথচ তাদের প্রত্যেকেরই মাশাআল্লাহ কয়েকজন করে সন্তান রয়েছে। আর প্রতিদিন ১৪/১৫ পারা পড়াতো খুব সাধারণ ব্যাপার, বরং কে কয় পারা বেশী পড়তে পারল এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এও লিখে এসেছি যে, আমার দাদী সাহেবা নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু কুরআনের হাফেযা ছিলেন। দৈনিক এক মঞ্জিল করে মুখস্ত পড়া তার বরাবরের অভ্যাস ছিল আর মাহে মুবারকে দৈনিক ৪০ পারা, অর্থাৎ এক খতম পূর্ণ করে আরো দশম পারা পড়া তার সব সময়ের অভ্যাস ছিল। এছাড়াও প্রতিদিন কয়েকশ করে বিভিন্ন তাসবীহ পড়াও তার মা'মূল ছিল। দৈনিক সর্বমোট প্রায় সতের হাজার তাসবীহ ছিল তার। তাযকেরাতুল খলীলে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আর আমার আব্বাজানের নানীর কথা তো ওপরে উল্লেখ করে এসেছি যে, স্বীয়পুত্র মাওলানা রউফুল হাসান মরহুমের পিছে এক রাকাতে পুরা কুরআনে পাক শুনেছিলেন। আল্লাহ পাকের বড়ই মেহেরবানী যে, ঘরের মহিলাদের মধ্যে মাহে মুবারকে কুরআনে পাকের জোর মাশায়াল্লাহ এখনো বাকী আছে। এ বেচারীরা রাতে দিনে শুয়ার সুযোগ খুব কমই পায়। রাতের অধিকাংশ সময় বাচ্চারা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা কালামে পাক তিলাওয়াত করা ও শোনার মধ্যে কাটায়। আর দিনে যখন শুতে যায় তখন বাচ্চাদের একজন এদিকে দিয়ে এসে খামচাতে থাকে ওদিকে দিয়ে একজন য়্যাঁ য়্যাঁ করতে থাকে। বেচারীদের অবস্থা দেখে আমার বড় দয়া হয় । আল্লাহ পাক তাদেরকে ভরপুর কবুল করুক।

মাশায়েখে কান্ধালা নামক পুস্তকে হযরত মাওলানা মুজাফফর হুসাইন সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর মামূল উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাহে মুবারকের পুরো রাত তিনি ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এক মুহূর্তের জন্যও বিছানায় পিঠ লাগাতেন না। হাশর দিনের ভয়ে চক্ষুদ্বারা সব সময় পানি ঝরতে থাকত। (মাশায়েখে কান্ধালা)

কথাগুলো প্রসঙ্গক্রমে এসে গেল। আব্বাজানের আসল রুচি তো ছিল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া। তবে সাহারানপুরের সব মসজিদেই তখন নামায আকাশ ফর্সা হলে শুরু করার নিয়ম ছিল। ফলে আব্বাজানকেও আকাশ ফর্সা হওয়ার পর ফজর নামায শুরু করতে হত। তবে হযরত সাহারানপুরী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর আমলে আকাশ পূর্ণ ফর্সা হলে ফজর পড়া হত। তবে মাহে মুবারকে তার দশ পনের মিনিট পূর্বে পড়া হত। আব্বাজান রহ. বাদ ফজর আরাম করতেন। দুই তিন ঘন্টা আরাম করার পর উঠে যেতেন এবং ইলমী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মাদরাসায় অবস্থানরত ছাত্রদের মধ্য হতে আব্বাজানের সাথে যাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাদেরকে তিনি রমযানে পড়াতেন। ইফতার পর্যন্ত এগুলোই ছিল তাঁর কাজ। দিনে কাউকে কুরআনে পাক শুনানো বা দাওর করার অভ্যাস ছিল না। দিনে কিছু অবসর সময় পেলে তাতে আওয়াজ করে কালামে পাক তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এ কথাও হয়তো কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে গঙ্গুহী অবস্থানকালে হযরত গাঙ্গুহী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর যুগে মাগরিবের আযান আব্বাজান নিজেই দিতেন। তার উচ্চস্বরে দীর্ঘ আযানের অভ্যাস ছিল। অনেক সময় তিনি বলতেন এটা আমি এজন্য করি যেন সকলে ধীরে সুস্থে ইফতার করে আপন আপন বাড়ী থেকে মসজিদে এসে জামাতে নামায পড়তে পারে। তদুপরি আযানের আওয়াজ অনেক দূরদুরান্তে পৌছে যায়। আমার আযানের মধ্যদিয়ে রোযাদাররা সুন্দরভাবে ইফতার সেরে নিতে পারতো। অতঃপর মসজিদে এসে হযরত ইমামে রব্বানী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর ইমামতিতে তাকবীরে উলায় শরীক হতে সক্ষম হত। হযরত কুতুবে আলম কুদ্দিসা সির্‌রুহুর এখানে নিছফুন্নাহারের শরয়ী হিসেবে দিনের ঠিক মধ্যভাগের সাথে ঘড়ি মিলিয়ে রান্নার খুব গুরুত্ব ছিল আব্বাজান বলেন, সূর্যাস্তের সময় এক দু'চারটি ঘাসপাতা চিবিয়ে ইফতার করে আযান শুরু করে দিতাম। সুস্থিরভাবে অনেক লম্বা করে আযান দিতাম।

মিরাঠ, দিল্লী, নওয়াবওয়ালি মসজিদ ও বহাটের রমযানে আব্বাজানের ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। মাশয়েখে কান্ধালা নামক কিতাবে লিখা হয়েছে যে, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব রহ. প্রত্যেক রমযানে স্বীয় মাতা ও নানীকে কালামে পাক শোনানোর জন্য কান্ধালায় চলে আসতেন এবং সব সময় তিন রাতে কুরআনে পাক খতম করে ফিরে যেতেন। যে বছর যিলকদ মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয় ঐ বছর এক রাতে কালামে পাক খতম করে চলে এসেছিলেন। (মাশায়েখে কান্ধালা) আপ্‌বীতী'তে আব্বাজান নাওয়ারাল্লাহুর মারকদাহু সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় নানা কথা লিখেছি, এখন আর কিছু মনে পড়ছে না। এ কিতাবের শুরুতেও হযরত গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর বর্ণনায় কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছি।

একথাও লিখেছি যে, শেষ রাতে আওয়াজ করে কালামে পাক তিলাওয়াত করার খুব অভ্যাস তাঁর ছিল, চাই নামাযে চাই নামায ছাড়া। অনেক সময় তাঁর কান্নার আওয়াজে গভীর নিদ্রা থেকে আমাকে জেগে যেতে হত। আমার আকাবির বুযুর্গদের মধ্যে "বুকাফিল্লাইল" অর্থাৎ রাতে ক্রন্দনকারী দু'জনকেই দেখেছি। হযরত শয়খুল ইসলাম মাদানী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু ও আমার আব্বাজান কুদ্দিসা সির্‌রুহু।

আপবীতীর কোথাও হয়ত লিখে এসেছি যে, সাহারানপুরের আশেপাশে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর যত সফর হত তার প্রায় সব সফরেই অধম হযরতের সঙ্গী হত। ঐ সময় হযরতের সফর হত ঝটিকা সফর বিকাল চারটায় হযরত সাহারানপুর আসতেন, স্বীয় গাড়ীতে আমাকে তুলে নিয়ে বেড়িয়ে বা ধলবপাড়ার সভায় তশরীফ নিয়ে যেতেন। রাত্রেই কিংবা ভোরে আমাকে সাহারানপুর রেখে তিনি ফিরে যেতেন। আভা নামাক স্থানের সফরে একবার হযরতের সাথে ছিলাম। হযরত বললেন, যাকারিয়ার চারপায়ী যেন আমার শুয়ার কামরায় বিছানো হয়। হযরতের সাথে কয়েকজন খাদেম ছিল, তাদের শুয়ার ব্যবস্থা অন্য কামরায় করা হত। মৌসুম ছিল শীতের যেহেতু আভার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পর্ক হযরত গাঙ্গুহী ও নানুতবী উভয়ের সাথেই ছিল এবং পরবর্তীতে হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী, হযরত মুহাম্মদ হাসান দেওবন্দী, শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী ও হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুমের সাথে ছিল, তাই তাঁদের সাহস একটু বেশী তাঁদের একজন হযরত শায়খুল ইসলামকে বলতে লাগল, এটা আবার

কেমন কথা যে, একজনের চারপায়ী হযরতের সাথে হবে, আর অন্যদের চারপায়ী অন্যস্থানে হবে? হযরত কোন জবাব দেয়ার পূর্বেই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, আমি এর উত্তর দিচ্ছি, আপনাদের কেউ হযরতের সঙ্গে থাকলে হযরতের সমস্যা হবে। তবে আমার সম্পর্কে হযরতের ধারণা হল, একটি বকরী যেন দরজায় বাঁধা আছে আরেকটি ছাগল ভিতরে পড়ে আছে।

হযরত শায়খুল ইসলাম নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী, নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু এবং হযরত আশেক ইলাহি মিরাঠী নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু, প্রমুখ বুযুর্গদের খিদমতে যখন হাযির হতাম তখনও তাঁদের ইরশাদ ও নির্দেশ হত, আমার চারপায়ী যেন তাঁদের নিকটে থাকে। আব্বাজানের নিকট তো সব সময়ই শুতে হত। মকতবের কোন শিশুকে উস্তাদ বেত মারতে থাকলে সে যেমন বিনিয়ে বিনিয়ে হিচকী মেরে কাঁদতে থাকে, রাত্রে তেমনিভাবে আব্বাজানকে কাঁদতে দেখেছি। হযরত শায়খুল ইসলাম নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু তো কাঁদতে কাঁদতে হিন্দী দোয়াও পড়তে থাকতেন। শুনেছি যে, হযরত গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররুহুর এখানে বাদ জোহর যখন হুজরা শরীফের দরজা বন্ধ করে দেয়া হত তখন কান্না ও হিচকীর আওয়াজ বাহিরের চত্বর থেকেও শোনা যেত।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কুদ্দিসা সিররুহুর মা'মূলাত

চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর বিভিন্ন কাহিনী আপবীতীর বহু স্থানে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তো শুধু রমযানের কাহিনীই আমার লক্ষ্য। ওপরে বর্ণিত কান্দালার খান্দানী রেওয়ায মুতাবেক। চাচাজানের অভ্যাস ছিল যে, যা কিছু খাওয়ার তা ইফতারির সময়ই খেয়ে নিতেন। চাচাজানের সময়ে চায়ের এহতেমাম হত না। তার খানা খুবই সামান্য ও সংক্ষেপ হত। তাঁর খানা ছিল না, আবু দাউদ শরীফের উল্লেখিত বাক্যটি মনে পড়ে গেল। আবু দাউদ শরীফে আছে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ইশার ওয়াক্ত যদি হয়ে যায় আর রাত্রের খানা তোমার সামনে এসে যায় তাহলে খানা প্রথমে খেয়ে নিবে। হাদীসটির বিস্ত

রিত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য তো হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে রয়েছে। এখানে হঠাৎ করে বাক্যটি আমার মনে পড়ে গেল। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর রা. কে বড় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, আমরা নবীজীর এমন কথাও শুনতে পেলাম! লোকটির আশ্চর্য হওয়ার কারণ এই ছিল যে, খানায় মশগুল হয়ে গেলে তো জামাত ছুটে যাবে। সুতরাং এমন নির্দেশ নবীজী কিভাবে দিলেন? ইবনে ওমর রা. তাকে বললেন,

ويحك ما كان عشاء هم ؟ اتراه كان مثل عشاء ابيك

যার অর্থ, আরে! ধ্বংস তুমি। তাদের আহারই বা কি ছিল? তুমি ভেবেছ কি তোমার বাবার মতো আহার ছিল তাদের? অর্থাৎ সাহাবায় কেরাম রা. দের আহারের তালিকা এত দীর্ঘ হত না, যেমনটি হয় তোমার বাবার মজলিসে। দু'চারটি খেজুর এক আধ পেয়ালা ছাতু এই তো ছিল তাদের আহার। আমার চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুর এখানেও খাদ্যের পরিমাণ এতটুকুই ছিল। এক আধটা রুটি ইফতারের সময় খেয়ে নিতেন।

যা হোক, ইফতারের পর মাগরিবের নামায পড়াতেন। বাদ মাগরিব দীর্ঘ নফলে মশগুল হয়ে থাকার অভ্যাস তাঁর বাল্যকাল থেকেই ছিল। তবে মাহে মুবারকে তা এত দীর্ঘ হত যে, ইশার আযানের কিছু পূর্বে শেষ হত। নফলের পর মসজিদেই কিছুক্ষণ শুয়ে পড়তেন। খাদেম ভক্তরা তখন শরীর টিপতে থাকত। প্রায় আধা ঘন্টা আরাম করার পর ইশার ওয়াক্ত হয়ে যেত। নিজেই তারাবীর নামায পড়াতেন। বাদ তারাবীহ সাথে সাথে শুয়ে যেতেন। ঐ সময় কোন মজলিস করা বা কারো সাথে কথা বলার মা'মূল ছিল না। অনেকবারই তিনি আমাকে একথা বলেছেন যে, বিতরের সালাম ফিরানোর পর বালিশে মাথা রাখার আগেই আমি ঘুমিয়ে যাই। তবে আমি অধম যখন চাচাজানের দরবারে মাহে মুবারকে হাজির হতাম, আর আমার মতো লোভী ও পেটুকের তো তারাবীর পরই হল আসল ইফতারীর সময়। ফুলরী ইত্যাদির ব্যবস্থা তো তখন থেকেই হত এছাড়াও দোস্তরা কোন ফল ফ্রুট হাদিয়া দিলে সেগুলোও খাওয়ার সময় হত ঐটা, ফলে চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুও কিছুক্ষণের জন্য এতে অবশ্যই শরীক হতেন। আমি অনুরোধ করে বলতাম, কষ্ট না করে আপনি গিয়ে আরাম করুণ, কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পনের বিশ মিনিট এতে ব্যয় করে দিতেন। রাত বারটার দিকে নিদ্রা ত্যাগের অভ্যাস ছিল তাঁর ঐ সময় খাদেমরা গরম গরম

দু'টি সিদ্ধ ডিম তাঁর খিদমতে পেশ করত। জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে অযু করতঃ ডিম দু'টি খেতেন। অতঃপর তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। একদম শেষ সময়ে সাহরী খেতেন। এমন সময় সাহরী খেতেন যে, অনেক দিন আমি নিজেই দেখেছি, ডান হাতে লোকমা নিয়ে একজনকে বলতেন পানি নিয়ে আস, আরেকজনকে বলতেন, আযান দাও। মুয়াযযিন আযান দেয়ার জন্য ছাদে উঠতে উঠতে তিনি খানা থেকে ফারিগ হয়ে যেতেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই আযান শুরু হয়ে যেত। গোলর খাওয়ার কাহিনী তো সম্ভবত কয়েক জায়গায়ই উল্লেখ করেছি। আমাদের জনৈক আত্মীয় দিল্লীর এক মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি মনে করলেন ভাইজান ইলিয়াস সাহেব যেহেতু সারা দিল্লীর পীর, তাই রমযানে হয়তা হাদিয়া তোহফা অনেক আসে। ফলে এক রাত্র তিনি কাটানোর জন্য এখানে এলেন। ইফতারের সময় চাচাজান খাদেমকে বললেন, ভাই খাওয়ার কিছু থাকলে হাজির কর। খাদেমরা উত্তর দিল, হযরত! রাতের সেই গোলর গুলোই রয়ে গেছে। তিনি বললেন, বাহ! বাহ! তাই নিয়ে আস। এটাই ছিল ঐদিনের ইফতার, এটাই ছিল মাগরিব বাদ খানা। সাহরীর সময় আবার জিজ্ঞস করলেন, কিছু আছে কি ভাই? থাকলে হাজির কর। খাদেমরা বললেন, হযরত! কিছু গোলর রয়ে গেছে। চার পাঁচটা গোলর খেয়ে রোজা রাখলেন।

বিস্তারিত বর্ণনা আপবীতীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আযানের পর আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়াতেন। রমযানে বাদ ফজর বয়ান করার কোন রেওয়াজ চাচাজানের আমলে ছিল না। মাওলানা ইউসুফ সাহেব মরহুমই সর্বপ্রথম তা শুরু করেন। চাচাজান বাদ ফজর ইশরাক পর্যন্ত জায়নামাযে বসে বসে যিকির আযকার ও অজীফা আদায় করতে থাকতেন। অন্যান্য সমস্ত খাদেমরা বাদ ফজর সাথে সাথে শুয়ে যেত এবং তাওফীক অনুযায়ী নিদ্রা ত্যাগ করত। ইশরাক আদায় করার পর চাচাজানের যদি কিছুটা ক্লান্তি অনুভব হত এবং সময় ও হাতে থাকত তাহলে কিছুক্ষণের জন্য আরাম করতেন। অন্যথায় মেওয়াতগামী মেহমানদেরকে নসীহত করতেন এবং যেসব মেহমান সবেমাত্র হাজির হয়েছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। চাচাজানের এখানে নবাগত মেহমানদের ব্যাপারে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হত। তাদের খাতিরে স্বীয় মামূলাতে বিঘ্ন ঘটাতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর এখানে সায়্যিদজাদাদের খুব বেশী কদর ছিল। তাদের খাতির তাওয়াযু ও

এহতেরাম করার জন্য আমাকেও অনেকবার তাকিদ করেছেন। সায়্যিদজাদা তার শাগরিদ বা মুরীদ হলেও তাদের অনেক দোষ ত্রুটি তিনি এড়িয়ে যেতেন। এক বার আমি চাচাজানের কোন এক খাদেম সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, আমারও তা জানা আছে, তবে সে সায়্যিদজাদা, শেষের শব্দটি তিনি এত সম্মানের সাথে উচ্চারণ করলেন যে, এতে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম।

আলী মিঞা চাচাজানের জীবন চরিত "মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব আওর উনকী দ্বীনী দাওয়াতে"র মধ্যে লিখেন, মাওলান মুঈনুল্লাহ নদভী বর্ণনা করেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। রমযান মাস ছিল। মাওলানা তখন নফলের নিয়ত বেঁধে নিয়েছিলেন। ছেলেকে বললেন, খানা রেখে দাও, আমি নিজে নিয়ে যাব। তিনি বুঝতে না পেরে খানা আমার কামরায় পৌছে দিয়ে চলে গেলেন। নামায শেষে হযরত আমার কামরায় চলে আসলেন, ওযরখাহী করে বললেন, ছেলেটিকে বললাম, খানা আমি নিজেই নিয়ে যাব। কিন্তু আমাকে সুযোগ না দিয়ে সে নিজেই নিয়ে আসল। পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আদর সোহাগ করলেন এবং মনসন্তুষ্টির কথাবার্তা বলতে থাকলেন। (দ্বীনী দাওয়াত)

এই সম্মান প্রদর্শনের পিছে বড় কারণ যেটি ছিল তা হল মাওলানা মুঈনুল্লাহ সাহেব সায়্যিদজাদা ছিলেন।

দুপুরে দেড় দু'ঘন্টা আরাম করার মা'মূল তাঁর ছিল। বাদ জোহর হুজরায় তশরীফ নিয়ে আসতেন এবং যে সমস্ত মেহমানরা বিদায় নিবে বা যারা সবেমাত্র এসেছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। আছর পর্যন্ত এ সিলসিলা চলতে থাকত। এছাড়াও রমযানে কারো ছবক থাকলে তাও পড়িয়ে দিতেন। বাদ আছর মাগরিব পর্যন্ত যিকরে জেহরী করতে থাকতেন। রমযান ছাড়া অন্যান্য সময় এ যিকির শেষ রাত্রেই করে নিতেন। তাহাজ্জুদের পর থেকে নিয়ে প্রায় ফজর নামায পর্যন্ত যিকির চলত। কারণ, রমযান ছাড়া অন্যান্য মাসে ফজর নামায আকাশ পুরোপুরি ফর্সা হয়ে যাওয়ার পর পড়া হতো। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহুকে এত পাবন্দীর সাথে যিকরে জেহরী করতে দেখেছি যে, অন্য কোন আকাবিরকে এমনটি করতে দেখা যায়নি। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বার তাসবীহ ও ইসমেজাতের যিকির রমযানে বাদ

আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আর অন্যান্য মাসে বাদ তাহাজ্জুদ থেকে ফজর পর্যন্ত খুব এহতেমামের সাথে চলত।

মারকদাহুর চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু তৃতীয় হজ্বের সফর রমযান মাসে শুরু হয়েছিলো। আলী মিঞা চাচাজানের জীবন-চরিতে লিখেন, ১৩৫১ হিজরীতে তিনি তৃতীয় হজ্ব করেন। নিজামুদ্দীন থাকতেই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। দিল্লীর স্টেশনে পৌছে তারাবীহ পড়া হল। তারাবীহ শেষে করাচীগামী প্লেনে উঠে পড়লেন। (দ্বীনী দাওয়াত)

চাচাজানকে বিদায় জানানোর জন্য দিল্লীর স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলাম। গাড়ীতে মাল সামান রাখার পর স্টেশন চত্বরে চাচাজান কুদ্দিসা সির্‌রুহু তারাবীহ পড়ালেন। বিদায় জানানোর জন্য যারা সঙ্গে ছিলেন তারা তো ছিলেনই, দিল্লীর অনেক লোকজনও এসে এই জামাতে শরীক হয়েছিলেন। অনেকে আপন আপন মসজিদে তারাবীহ সেরে চাচাজানের পিছে এসে শরীক হলেন। কারণ মসজিদগুলোতে সাধারণত জলদি জলদি তারাবীহ শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে গাড়ীতে সামানপত্র রাখতে রাখতে দেরী হওয়ায় চাচাজানের তারাবীহ দেরীতে শুরু হয়েছিলো। তারাবীতে আলিফ লাম মীম হতে পড়া শুরু করলেন এবং মসজিদে যেমন ধীর গতিতে পড়তেন সেভাবে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে তারাবীহ আদায় করলেন। কারণ গাড়ী সেদিন লেট ছিল এবং ছাড়তে প্রায় সোয়া ঘন্টা বাকী ছিল। স্নেহাস্পদ মাওলানা ইউসুফ রহ. এর মতো সব সময় তিনি তাবলীগী আলোচনায় মশগুল থাকতেন। এটা দেখেছেন এমন লোক এখনো হয়ত হাজার হাজার জীবিত আছেন। খেতে বসেও এই আলোচনা। মোট কথা, উঠতে বসতে এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর ঐ একই আলোচনা।

স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ সানী সাওয়ানেহে ইউসূফীতে লিখেন, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. সব সময় রমযানের বড় এহতেমাম করতেন। মেওয়াত অঞ্চলের জামাত এ মাসে অধিক হারে নিজামুদ্দিন মারকাজে আসত। বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্দেশ্যে জামাত বের হয়ে যেত। খোদ দিল্লী মারকাজে মাকামী কাজও খুব এহতেমামের সাথে করা হত। (সাওয়ানেহে ইউসূফী)

আপবীতীর ষষ্ঠ খন্ড লিখার কাজ চলছিলো। আকাবির বুযুর্গদের সাধনা মুজাহাদার আলোচনা করা হচ্ছিল তখন। মাশায়েখদের হালাত শোনার পর কিছু ঘটনা মনে পড়ে গেল, আর কিছু ঘটনা এমনিতেই মনে

পড়ে গেল। তখন খিয়াল হল, এসব আকাবীরদের রমযানের মা'মূলাতগুলো আলাদাভাবে জমা করবো এবং সেগুলোকে "ফাযায়েলে রমযান" নামক কিতাবে শেষ পর্ব হিসেবে জুড়ে দিব। যে উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চাচাজান নাওয়ারাল্লাহু মারকদাহু ফাযায়েলে রমযান লিখেয়েছিলেন, এটা তার পরিপূরক হবে। কিন্তু হায়! ধিক আমার ওপর। এ চক্ষুদ্বয় জীবনে অনেক কিছুই দেখেছে। হযরত গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর আখেরী যুগ থেকে নিয়ে তাঁর খলীফা এবং খলীফাদের খলীফাদেরকেও খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং অধমের প্রতি ঐসব আকাবির বুযুর্গদের স্নেহ ও তাওয়াজ্জুহ ও হয়েছিলো সীমাহীন। কিন্তু আমার মতো মাহরুম ও দুর্ভাগা হয়ত আর কেউ নেই। আকাবীরদের স্নেহ ভালবাসা ও তাওয়াজ্জুহ ঠিকই ছিল, কিন্তু কুকুরের লেজ দাশ বছর নয় ষাট বছর পর্যন্ত নলের মধ্যে থেকেও সেই বাকাই রয়ে গেল।

কোথাও হয়ত লিখেছি যে, ১৩৪৫ হিজরীতে হযরত সাহারানপুরী কুদ্দিসা সির্‌রুহু যখন মদীনা পাকে "বাজলুল মাজহুদ" লিখতে ছিলেন আর এ অকর্মার দেহ সেখানে হাজির ছিল সত্য, কিন্তু নাজানি তার মন কি কি আজে বাজে চিন্তায় ব্যস্তছিলো। বজল লিখাতে লিখাতে আমার হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহু বলে উঠলেন, - من بتو مشغول وتوبا عمرو وزيد

আমি তো তোমার ধ্যানে মশগুল. আর তুমি যায়েদ ওমর নিয়ে ব্যস্ত। সে দৃশ্য যখন আমার মনে পড়ে তখন শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। হযরত যখন আমাকে একথা বলেছিলেন তখন মনে পড়ে যে, আমি অন্য কোথাও ছিলাম। আর এটাও মনে পড়ে যে, হযরতের একথায় মনে এতো চোট লেগেছিলো যে, অনেকক্ষণ ধরে আমি শুধু এই চিন্তাই করতেছিলাম যে, কোথায় ছিল আমার মন? কিন্তু কখনো আর তা মনে পড়ল না।

আকাবির বুযুর্গদের এসব কথা, এসব কাহিনী লিখানোর সময়ও নিজের বদহাল ও দুস্কর্মের কথা চিন্তা করতেছিলাম। আব্বাজানের কাছ থেকে একটি কিচ্ছা বার বার শুনেছি এবং নিজেও কোথাও দেখেছি যে, রাত্রে শিয়াল খুব ডাকতে থাকে। বিশেষ করে শেষ রাত্রে তো হুক্কা হুয়া করতেই থাকে। এই শিয়ালদেরই এক কাহিনী। বলা হয়, শিয়ালদের দল যখন এক জায়গায় জমা হয় তখন তাদের বড়টা খুব মজা করে উঁচু আওয়াজে বলতে থাকে, পেদারে মান সুলতান বুদ" আরে! আমার বাবা তো বাদশা ছিলেন।

তার একথা শুনে সমস্ত শিয়ালগুলো এক সাথে এক তালে চেচিয়ে উঠে বলে, তুরাচে মুরাচে, তুরাচে মুরাচে, তুরাচে মুরাচে। এতে তুমিই বা কোন স্বর্গে উঠে গেলে, আর আমাদেরই বা কি ক্ষতি হয়েছে।

এ অধমের অবস্থা হুবহু এমনই। চিৎকার মেরে বলতে থাকি, চাচা এমন ছিলেন, পিতা এমন ছিলেন, দাদাজান তেমন ছিলেন, পীর তেমন ছিলেন, পীরের পীর এমন ছিলেন কিন্তু শেষ ফলাফল সেই তুরাচে মুরাচে, তুরাচে মুরাচে। হায়! আল্লাহ পাক যদি তার ফযল ও করমে ঐসব আকাবির বুযুর্গদের ইবাদত- বন্দেগী, আখলাক-চরিত্র ও গুণাগুণের কিছু অংশ ও কয়েকটি ফোঁটা দান করে দিতেন তাহলে কতইনা মজা হত।

ওগো খোদা! এই মহান বুযুর্গদের ওসীলায়।
শেষ পরিণাম আমার যেন ভাল হয়।
নবীজীর সুমহান বংশধর ও সাহাবীদের ওসীলায়।
তোমার দয়া সদা যেন আমার সঙ্গে হয়।
ঐ শক্তি আমায় দান কর প্রভূ হে !
আমার নফস সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখে যে।
মৃত্যুর সময় কালিমা যেন আমার নসীব হয়।
নেককারদের সাথে যেন আমার হাশর হয়।
উভয় জগতে তুমি যেন আমার সহায় হও।
কুল জাহানের সকল বুযুর্গ ওলী আল্লাদের ওসীলায়।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العا مين والصلوة والسلام على سيد الانبياء
والمرسلين وعلى اله واصحابه وابناءه اجمعين

মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধালবী
১লা রজব, সোমবার, ১৩৯২ হিজরী

আমাদের প্রকাশিত কিছু কিতাব

☞ **আকাবের কা তাকওয়া (বুযুর্গগণের খোদাভীতি)**
মূলঃ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ).
এ কিতাবে বুযুর্গগণ কিভাবে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেছেন তার বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

☞ **আকাবের কা সুলূক ও ইহসান**
মূলঃ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ).
এ কিতাবে বুযুর্গগণের পীর মুরীদীর তরীকা খুব নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

☞ **সুন্নাতী যিন্দেগী**
মূলঃ মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াস
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের সুন্নাত, বিভিন্ন দোয়া-মুনাজাত ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্বলিত এ কিতাব।
সুন্নাত অনুসারে জীবন পরিচালনায় আগ্রহী ব্যক্তির জন্য এক অদ্বিতীয় কিতাব।

☞ **ইমামগণের মতভিন্নতা কী ও কেন ?**
মূলঃ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ.
কুরআন হাদীসের আলোকে ইমামগণের মতভিন্নতার কারণ, এ মতভিন্নতা কী ও কেন? এ বিষয়ে এক অদ্বিতীয় কিতাব। হাদীস ও মাসয়ালার কিতাব পড়ার পূর্বে এ কিতাবটি পড়ে নিলে, হাদীস ও মাসয়ালা বুঝতে বড় সহায়ক হয়

☞ **মাহমূদুস সুলূক (ইমদাদুস সুলূক)**
মূলঃ হযরত মাওঃ রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ.
এ কিতাবে ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি বিষয়ের একটি অদ্বিতীয় কিতাব।